রোমান্টিক

– এম খান

১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস। যায়যায়দিন *ভালোবাসা* সংখ্যায় ভরে যাবে ভালোবাসার ঘটনায়। কিন্তু আমি লিখছি অভালোবাসা, অরোমান্টিকতার কথা।

অল্প বয়স থেকেই ছিলাম খুব রোমান্টিক। কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট পাসের পর বাবাকে হারিয়ে ব্যবসার কারণে এবং উচ্চ শিক্ষা লাভ করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রোমান্স করার সময় বা সুযোগ ছিল না। ইচ্ছা ছিল বিয়ের পরই রোমান্স করবো বৌয়ের সঙ্গে। কিন্তু ত্রিশ বছরে খুব উচ্চ শিক্ষিত ও স্মার্ট বৌ পেলেও বৌ–এর মধ্যে রোমান্টিকতার ছিটাফোটাও নেই।

আমার স্ত্রী খুব গুণী। একজন মহিলার বিভিন্ন গুণাবলী যদি বিশ্লেষণ করা যায়, যদি প্রতিটি বিষয়ে ১০০ নাম্বার ধরা হয় তাহলে সে পাবে নিম্নরূপ :

	%
১. আদর্শ মা	৮০
২. আদর্শ কন্যা	৮০
৩. ঘরকে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে	৯০
৪. রূপচর্চা সাজসজ্জা ও অন্যের কাছে উপস্থাপক	৯০
৫. রান্না করা, বাচ্চার দেখাশোনায়	৮৫
৬. আদর্শ স্ত্রী	৫০
৭. প্রেমিকা বা রোমান্টিকতায়	১০

যদিও উপরের মার্কশিট আমার স্ত্রীর পছন্দ হবে না তবুও তাকে এ নাম্বারই দেবো।

কিছু উদাহরণ দিই।

আমার ইচ্ছা যখনই কলিংবেল বাজাবো তখনই সে দরজা খুলে হাসি মুখে স্বাগতম জানাবে। কিন্তু দেখতে পাই তার মুখ নয়, তার নিতম্ব। কোনো মতে, দরজার হুড়কো-টা খুলেই নিতম্ব দোলাতে দোলাতে ভেতরে ঢুকে যায়।

শীতের রাতে লেপের নিচে তাকে জড়িয়ে ধরে শুতে চাই। কিন্তু আমার পাশে শুলে তার বলে ঘুম হয় না। দুজনে দুপাশে থাকি, মাঝে থাকে কন্যা।

বিয়ের পর পর একবার পাশাপাশি বসে টিভিতে এক সিনেমা দেখার সময় একটা রোমান্টিক দৃশ্য দেখে ভালোবাসায় আক্রান্ত হয়ে যখন তার চিবুক ধরে আদর করতে গেছি তখন তার ঝামটা, তোমার জন্য শান্তিতে একটু টেলিভিশন দেখার জো আছে? তোমার কাছে বসলেই খোচা–গুতা!

ওর কথা শুনলে ভালোবাসা পালানোর পথ পায় না।

শুনেছি রোমান্টিকতা সংক্রামক। কিন্তু আমার বেলায় তা খাটে না। একবার কোনো এক কারণে তাকে অনেক আদর করার পর যখন প্রতি আদরের অপেক্ষায় আছি তখন সে জানালো, কাল ছেলের স্কুলে বেতন দিতে হবে যেন আমি ভুলে না যাই। কোন সময়, আর কি কথা!

যাক। আমার স্ত্রীর এমন ক্ষমতা যে মাইক্রোওভেনে গরম করা বস্তুকেও মাত্র একটি কথার দ্বারা ডিপ ফৃজের বস্তুতে পরিণত করতে পারে। সিনেমা, নাটকের ভালোবাসার দৃশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করলে সে বলে, ওসব সিনেমা-নাটকে হয়। তা বাস্তবের জন্য নয়।

যায়যায়দিনের বিশেষ সংখ্যা যেখানে ভালোবাসার কথা থাকে তাকে পড়িয়েছি, কোনো ফল হয়নি। আমার সমবয়সী বন্ধুরা যখন সপ্তাহে দুই তিনবার স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করে, আমার দশ দিনেও একবার প্রেম করা হয়ে ওঠে না।

ভালোবাসার কথা বললে তার উত্তরে সে বলে, তোমাকে তো অনুমতি দিয়েই রেখেছি। আরো একটি বিয়ে করো।

আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, সে আমাকে খুব ভালোবাসে।

আমিও তাকে খুব ভালোবাসি।

আমি খুব ধার্মিক ব্যক্তি। দ্বিতীয় বিয়ে করা বা নীতিহীন কোনো কাজ করা পছন্দ করি না এবং আমাকে দিয়ে তা সম্ভবও নয়। স্ত্রীর এই অভালোবাসা সুলভ ব্যবহারে খুব কষ্ট পাই। সব খুলে বলেছি, বোঝাতে চেয়েছি। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। আমার এই রোমান্টিক মন কেবলই স্ত্রীর ভালোবাসার জন্য কেদে মরে।

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

কি ?

– আজমত রানা

একদিন বাবা বললেন, বিয়ে কর।

বাড়ির সবাই এখানে-সেখানে দুই চারটা মেয়ে দেখেও ফেললো। একদিন আমাকেও একটা মেয়ে দেখতে বললো। সেই প্রথম।

প্রতিবেশী একজনের বাড়িতে অনানুষ্ঠানিকভাবে শুধু এক পলকের জন্য তাকে দেখলাম। সে চোখ তুলে আমাকেও দেখলো। এই দেখাদেখিটা ঘটতে সময় লেগেছিল এক মিনিটেরও কম। আমার হ্যা অথবা না বলার আগেই ঘটনাক্রমে একজনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যায়। আর তাকে মনে থাকেনি, থাকার কথাও নয়।

এসব অনেক পুরনো কথা। সব ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ সেদিন ডাকযোগে একটা চিঠি পেলাম। আশ্চর্য! সেই মেয়েটি লিখেছে।

প্রায় পনেরো বছর পরে মেয়েটি তার দুর্বলতার কথা প্রকাশ করলো। সে এখন একজনের স্ত্রী, সন্তানের মা। অঢেল বিত্তের মাঝে বসবাস। সবাই সুখী বলেই জানে। আমিও এখন ধরাছোয়ার

বাইরে। তবুও এতোদিন পরে তার স্বীকারোক্তি আমার ভেতরে নতুন বোধের জন্ম দিয়েছে। প্রশ্ন জাগে, এটাকেও কি ভালোবাসা বলে?

ঠাকুরগাও থেকে

হোটেল

– মাসুদ রানা

২৮ মার্চ ২০০২ সাল। আমরা মোট দশজন ঢাকার উদ্দেশ্য রওনা হলাম। এজেন্সির কথা মতো তাদের অফিসের কাছেই একটি হোটেলে রাত কাটানোর জন্য উঠলাম। প্রত্যেকের সঙ্গেই তাদের গার্ডিয়ান রয়েছে। আমার সঙ্গে আমার বাবা।

দোতলায় প্রত্যেকেই রুম নিল। আমি এবং আমার বাবা এক রুমে। পাশাপাশি দুটো সিঙ্গল বেড। চারদিকে ভীষণ নোংরা। বাবা এতো অপরিষ্কার দেখে ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। হোটেল বয়কে ডেকে বললেন এগুলো পরিষ্কার করতে।

ছেলেটি এমনভাবে দাড়িয়ে রইলো যেন কিছুই শোনেনি। কিছুক্ষণ পর জি, আচ্ছা বলে চলে গেল।

বিকাল চারটা। রুম থেকে বেরিয়ে দেখি বাইরে নয়জন বসে আড্ডা দিচ্ছে। আমাকে দেখে সবাই বেশ আগ্রহ নিয়ে বললো, বস তাড়াতাড়ি, কথা আছে।

বললাম, কি কথা?

রাজ বললো, আ রে, দারুণ ব্যাপার ঘটে গেছে!

রাজ রাজশাহীর ছেলে। নয়জনের মধ্যে তার সঙ্গে আর ইমরানের সঙ্গে আমার বেশ সখ্যতা হয়েছে। ইমরান আমাদের মধ্যে বয়সে সবার ছোট।

রাজ তাকে বললো, ইমরান, তুমি একটু রুম থেকে ঘুরে আসো তো।

ইমরান অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে চলে গেল।

তার চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ ফিশ ফিশ করে বললো, জানিস, আমরা কোথায় এসে পৌছেছি?

কেন? ঢাকায়।

আরে সেটা তো জানিস ভালো কথা। কিন্তু এখন আমরা সবাই কোথায় আছি বলতে পারিস? একটা মৌচাকের ভেতর।

রেগে গিয়ে বললাম, কি সব উল্টা–পাল্টা বকছিস।

রাজ একটা মুচকি হাসি দিয়ে বললো, আ রে, উল্টাপাল্টা না। সত্যিই আমরা একটা মৌচাকের মধ্যে এসে পড়েছি। এখানে নানান রকম মধু পাওয়া যায়। শুধু মালপানি দিলেই ব্যস, রুমে পৌছে যাবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সবার দিকে তাকিয়ে দেখলাম প্রত্যেকের চোখ চিক চিক করছে যেন কেউই আর মধু খাওয়ার লোভ সামলাতে পারছে না। আমরা ঠিক বসেছিলাম দুই তলার সামনের দিকে

ব্যালকনির মতো একটি জায়গায়। এখান থেকে বাইরের রাস্তা এবং হোটেলে ঢোকার পথ দুটোই দেখা যায়।

পেছন দিকে তাকালেই তৃতীয় তলায় ওঠার সিড়িটা পরিষ্কার দেখা যায়। রাজ আমাকে টেনে গ্রিলের কাছে নিয়ে গিয়ে বললো, নিচে দেখো ওই মেয়েগুলোকে।

দেখলাম তিনটা বোরখা পরা মেয়ে হোটেলে ঢুকছে। এরপর রাজ আমাকে সিড়ির দিকে তাকাতে বললো। দেখলাম মেয়ে তিনটি সিড়ি দিয়ে উপরের দিকে উঠে গেল। কিছুক্ষণ পর একটি মেয়ে উপর থেকে নেমে বেরিয়ে গেল। খেয়াল করে দেখলাম কিছুক্ষণ পর পরই এ রকমভাবে কিছু মেয়ে উপরে উঠছে আবার কিছু নিচে নামছে। মাঝে মধ্যে কিছু পুরুষও আসা-যাওয়া করছে। মজার বিষয় হচ্ছে, প্রত্যেকটি মেয়েই বোরখা পরা। এবার পুরো ব্যাপারটা মাথায় ঢুকলো।

রাজ আমাকে দেখে বললো, কি রে, খাবি নাকি মধু?

এ কথা শুনে সবাই হেসে ফেললো। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। সবাইকে বললাম, চল চা খেয়ে আসি।

সবাই গেলাম হোটেলের সামনেই একটা চায়ের দোকানে। চা খেতে খেতে দেখলাম, হোটেলটির নাম একটি হলুদ সাইনবোর্ডে লাল রঙ দিয়ে লেখা। আমাদের মধ্যে একজনের খালার বাসা ঢাকাতেই। সেই সুবাদে সে ঢাকাতে প্রায়ই থাকতো। তার নাম সজীব। সজীবকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার, চুপচাপ কেন?

সজীব উত্তরে বললো, শালারা, এমন একটা হোটেলে ওঠালো। বেড়ে বসতেই আমার ঘেন্না লাগছে।

সাব্বির বললো, কেন, সমস্যা কি?

সজীব হেসে বললো, সমস্যা শুধু আমাদের জন্যই, বাকিদের জন্য সুবিধা। এসব হোটেলে কেউ রাত কাটাতে আসে না। সবাই আসে মজা মারতে। এখানে আশপাশে যতোগুলো হোটেল আছে সবগুলোই এ দুই নাম্বার ব্যবসা করে।

বাইরে এসে দেখি ডান পাশে বেশ বড় একটি আবাসিক হোটেল। রুমে এসে দেখি লক করা, পাশের রুমে গার্ডিয়ানরা সবাই বসে গল্প করছেন। আমাকে দেখে ইমরানের বাবা বললেন, কোথায় গিয়েছিলে তোমরা? ইমরান এখানে একা বসে আছে।

বললাম, কোথাও না আংকল, এই একটু নিচে গিয়েছিলাম।

ইমরানের আব্বা সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, চলেন ছেলেদেরকে নিয়ে খাওয়া-দাওয়াটা সেরে আসি। সকাল সকাল উঠতে হবে।

রাতের খাওয়া সেরে রুমে এসে বসলাম। বাবা বললেন, ব্যাগটা গুছিয়ে নে।

খেয়াল করলাম বাবার চোখমুখে এক অন্য রকম বিষণ্ণতা যেন বলতে চাইছে, আমার পাশে এসে বস, তোকে একটু আদর করি।

কাল সকালে ফ্লাইট আর কালকেই ছিল আমার ফার্স্ট ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা। আব্বার ইচ্ছাতেই ভর্তি হয়েছিলাম কারমাইকেল কলেজে অর্থনীতি বিভাগে। আমার মায়ের স্বপ্ন ছিল ছেলে অনার্স পাস করে ব্যাংকের বড় অফিসার হবে। কিন্তু প্রত্যেকের স্বপ্ন হয়তো পূরণ হয় না। সে কারণেই আমাকে

বিদেশ যেতে হচ্ছে অর্থ উপার্জনের জন্য। মা আমাকে দূরে রাখবে না বলে ঢাকা ও রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দিতে দেয়নি। এখন হাজার মাইল দূরে চলে যাচ্ছি।

আব্বার সঙ্গে সব সময় একটা দূরত্ব রেখে চলতাম আর কথাও তেমন বেশি একটা বলতাম না। কোনো কিছুর দরকার হলে মাকেই বলতাম। মাকে বাবা প্রায়ই বলতেন এই ছেলে কি করে খাবে, একে নিয়ে ভীষণ চিন্তা হয় আমার। যে ছেলে এখনো মায়ের হাতে ভাত খায় তার দ্বারা কিছু হবে না। অথচ এই আমি এখন প্রতিদিন ১২ ঘণ্টা ডিউটি করছি। বিদেশের মাটিতে পা রেখেই মনে হয়েছিল এখানকার প্রকৃতি, বাতাস, আবহাওয়া আমাকে বরণ করে নিচ্ছে না। পেছনে আমার দেশের মাটি ডাকছে আমাকে ফিরে আসার জন্য।

এখানে সব কিছুই আছে। টাকা হলে সব কিছুই পাওয়া যায়। এখানেও রয়েছে ঢাকার সেই হোটেলের মতো অনেক হোটেল। শুধু নেই মায়ের ভালোবাসা, বাবার আদর, সবুজ প্রকৃতির মিষ্টি সুবাস। দেশে থাকতে জানতাম এ দেশের লোক খুব ভালো, ভদ্র, অমায়িক, চরিত্রবান। কিন্তু এখানে এসে দেখি সব তার উল্টোটা। বর্বর যুগে এ জাতি যেমন অজ্ঞ, মূর্খ ছিল এখনো তার প্রভাব তাদের মধ্যে আছে। এরা আগেও পাথর মারতো, এখনো পাথর মারে। এখানে কোনো ছেলে যদি গোফ না রাখে তাহলে তারা ভাবে যে, সে বাকলা (হিজড়া)। এ দেশের মেয়েরা সবাই কালো বোরখা পরে। কিন্তু বোরখার ভেতর তারা এতোটাই আধুনিক যে পাশ্চাত্যের মেয়েদেরকেও হার মানায়। মেয়েদের কাপড়ের দোকানে গেলে ধারণা পাওয়া যায় যে, তারা কতোটা খোলামেলা পোশাক ব্যবহার করে। যা আমাদের দেশের মেয়েরা কখনো চিন্তাও করতে পারবে না।

এ দেশের প্রত্যেকেই নিজেকে আমির অর্থাৎ রাজা বলে মনে করে। ছেলেরা সারাদিন ঘুমায় আর রাত হলেই বেরিয়ে পড়ে গাড়ি নিয়ে। সারা রাত গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াবে এটাই হলো এদের প্রতিদিনের কাজ। এভাবেই দিন কেটে যায়। আর আমার দিন কাটছে অপেক্ষায়, কবে দেশে ফিরবো, কবে মায়ের হাতে ভাত খাবো।

যখন কিছু ভালো লাগে না তখন প্রিয় যায়যায়দিনের সংখ্যা হাতে নিয়ে পাতা উল্টাতে থাকি। একই সংখ্যা দুই তিনবার পড়ে ফেলি। যখন পড়ি তখন মনে হয় যেন দেশেই আছি। মাঝে মধ্যে মনে হয় প্রতিদিন যদি যায়যায়দিনের নতুন সংখ্যা বের হতো তাহলে প্রতীক্ষার সময়গুলো দ্রুত কেটে যেতো।

এবারই প্রথম ভ্যালেনটাইনস ডে-তে আর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে পারবো না। তবে যাযাদির মাধ্যমে আমার সকল বন্ধুদেরসহ পলিন, লিপি, নিলু ও পলাশকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আল তাইফ, সউদি আরব থেকে

নতুন মা

– মাসুদুর রহমান রানা

১৯৯৭ সাল। এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ইউনিভার্সিটি ভর্তি কোচিংয়ে ভর্তি হবো। ঢাকা যাচ্ছি, কোচের টিকেট কেটে বসে রয়েছি। আমার অবস্থান সিটের মাঝামাঝি। আমার ঠিক বিপরীত দিকের

সিটে একজন মধ্য বয়সী মহিলা বসা। বাস চলছে আর বার বার আমার দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছেন। আমি তার চাহনি দেখে খুব লজ্জাবোধ করছিলাম। তারপরও তার অবিরাম চাহনি আমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিল।

ইতিমধ্যে বাস দৌলতদিয়া ঘাটে এসে পৌছালো। বাস থেকে লঞ্চে উঠলাম। লঞ্চের পেছনে দাড়িয়ে একটা ডাব কিনে খাচ্ছিলাম। দেখি ওই মহিলা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। কৌতূহলী হয়ে নিজে থেকেই প্রশ্ন করলাম, আপনি আমার দিকে বার বার এভাবে তাকাচ্ছিলেন কেন? এই প্রশ্ন করা মাত্রই তার দুইচোখ বেয়ে পানি পড়তে শুরু করলো। মনে মনে ভাবলাম, আমাকে আবার কোন বিপদে ফেলেন কে জানে? তারপর বললাম, প্লিজ, কাদবেন না।

আস্তে আস্তে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে বলতে লাগলেন, ঠিক তোমার মতো আমার একটা ছেলে ছিল। সে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে বাবার কাছে যাচ্ছিল। সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। মারা গেল প্রায় দুই বছরের মতো হবে। সেই ছেলের স্মৃতি নিয়ে আজো বেচে আছি। শুধু আমার পাশে বসা দেখলে ওই মেয়েই এখন আমার আশার আলো। আর সেই ছেলের স্মৃতি আজো আমাকে দুঃখের সাগরে ভাসায়। বহুদিন পর তোমাকে আজ দেখে আমার সেই ছেলের কথা মনে হলো। কারণ ঠিক তোমার মতোই চেহারা ছিল আমার ছেলের। তোমাকে দেখে চমকে উঠি আমি। একি করে সম্ভব! মানুষে মানুষে এতো মিল হয় কিভাবে?

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, হতে পারে। ধীরে ধীরে তার জমানো কথা শুনে মায়া লেগে গেল। তাকে এক পর্যায়ে *মা* বলে সম্বোধন করলাম। আর বললাম, কি হয়েছে, আপনার ছেলে মারা গেছে। আজ থেকে আমি আপনার ছেলে।

বহু কথা হলো। তারপর বাস মানিকগঞ্জ চলে এলো। মহিলা এবং তার মেয়ে ঠিকানা দিয়ে বার বার অনুরোধ করলো তার বাসায় যাওয়ার জন্য।

বললাম, আচ্ছা মা, যাবো।

মাথায় হাত দিয়ে আদর করলেন। কিন্তু তা দীর্ঘ স্থায়ী হতে পারলো না হেলপারের ডাকাডাকিতে। বাস যতোক্ষণ তার দৃষ্টির আড়াল হলো না ততোক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়েই রইলেন।

আমি জানালার গ্লাস খুলে তাকিয়েই রইলাম। মহিলার স্বামী মানিকগঞ্জে সরকারি চাকরি করেন। তিনি ও তার মেয়ে ফরিদপুর থাকেন।

বাসায় গিয়ে মাকে সমস্ত ঘটনা বললাম।

মা তার কথা শুনে আরো দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, তার সঙ্গে তোর দেখা করা উচিত। একদিন মা আমাকে পাচশ টাকা হাতে দিয়ে বললেন, যা তোর নতুন মায়ের সঙ্গে দেখা করে আয়।

চলে গেলাম। ফরিদপুর তার বাসার ঠিকানায়। বাসায় পৌছাতেই মহিলা আমাকে জড়িয়ে ধরে কেদে ফেললেন, আর বললেন, এসেছিস বাবা!

বললাম, হ্যা মা। ঘরে ঢুকেই দেখি একটা বড় সাইজের ছবি টানানো। ওই ছবিটা তার ছেলের। হুবহু আমার মতো না হলেও অনেকাংশ আমার চেহারার মতো। তবে দারুণ মিল রয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে।

আমি মাঝে মধ্যে তাদের বাসায় যেতাম। আমাকে এমন আদর যত্ন করতেন যেন আমার আপন মা। খাওয়া–দাওয়া থেকে শুরু করে সব কিছুতেই খেয়াল করতেন। এমনকি ঘুমাতে গেলেও আমার মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতেন এবং বলতেন, তুই যে আমার হারিয়ে যাওয়া ছেলে। এখন তোকে আর হারাতে চাই না বাবা।

একদিন বিকেলে মাঠে বসে রয়েছি। কয়েকটা বখাটে ছেলে এসে বলে, এই ছেলে, বেশ কয়েকদিন থেকে তোমকে এ বাসায় দেখছি। কি করো এ বাসায়?

আমি বললাম, ওই মহিলা আমার মা হন।

একটা ছেলে হেসে বললো, শুনেছি, ওনার একটা ছেলে ছিল, সে মারা গিয়েছে। তাহলে তিনি অর্থাৎ মহিলা তোমার শাশুড়িমা হয় বুঝি?

দেখো, বাজে কথা বলবে না। ওই মেয়ে আমার বোন হয়। এ কথা বলেই চলে এলাম। বাসায় এসে মাকে সব বললাম। তিনি আমার কথা শুনে বলেন, ওই ছেলেগুলো আমার মেয়েকে দেখলেই বাজে মন্তব্য করে। ওদের কথায় কান দিও না।

একদিন বিকেলে মাকে বললাম, অনেক দিন তো হয়ে গেল এসেছি। কাল চলে যাবো। মায়ের মুখ অন্ধকার হয়ে এলো। বললাম, আবার কয়েকদিন পর আসবো।

কিছুতেই আমাকে যেতে দেবেন না। তারপরও রওনা হলাম। দরজায় দাড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না! তার চোখের তপ্ত অশ্রু আমার হাত বেয়ে বেয়ে পড়তে লাগলো। আমিও কান্না ধরে রাখতে পারলাম না।

মায়ের ভালোবাসা পেয়ে কেদেছি নীরবে নিভৃতি। তারপর ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি, বাবার বদলিতে বেশ বছর খানেক দেখা করতে পারিনি। একদিন ফরিদপুর তার বাসায় গিয়ে জানতে পারলাম তিনি চলে গেছেন বাড়ি বিক্রি করে। কারণ তার মেয়েকে ওই বখাটেগুলো নাকি খুব ডিস্টার্ব করছিল।

মানিকগঞ্জ গেলাম, মেয়েটির বাবাও বদলি হয়ে চলে গেছেন। আজ প্রায় পাচ বছর সেই মায়ের সঙ্গে দেখা নেই। তার জন্য আজও আমার মন কাদে। ফিরে পেতে চাই আমার মাকে। কিন্তু কিভাবে?

ইসলামপুর, ঢাকা থেকে

ধ্রুবতারা

– মোহম্মদ মহসিন

রুহির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার অনেক আনন্দের, অনেক কষ্টের স্মৃতি। তার মুখটি স্মরণে এলে একদিকে যেমন এক অপার্থিব আনন্দে মন কানায় কানায় ভরে যায় তেমনি অন্যদিকে এক দুঃসহ কষ্টে হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়।

রুহি বয়সে আমার কয়েক বছরের ছোট হলেও পাশাপাশি বাড়ি হওয়াতে আমরা দুজন বাল্যকাল থেকেই এক সঙ্গে হেসে-খেলে বড় হয়েছি। একই স্কুলে পড়াশোনা করেছি। সে আমার তিন ক্লাস জুনিয়র হলেও আমাদের অকৃত্রিম বন্ধুত্বে তা বিন্দুমাত্র বাধা সৃষ্টি করেনি। আমরা দুজনই স্কুলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলাম। গ্রামের মেয়ে হয়েও এবং কোনো রকমের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াও রুহি নৃত্যে অসাধারণ ছিল। স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের রুহির নাচ ছিল অবধারিত। আর আমি নিয়মিত অভিনেতা ছিলাম স্কুলের বার্ষিক নাটকের। স্কুলের সেই মধুর দিনগুলোর কথা আজো খুব মনে পড়ে। কিভাবে যেন আমরা দুজন দুজনার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়লাম। জীবনে যে বিরহ আসতে পারে তা দুজনার ভাবনায়ও আসেনি।

যদিও আমাদের মফস্বলের কলেজে ডিগ্রি পড়ার ব্যবস্থা ছিল তারপরও এইচএসসি পাস করার একটু উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঢাকা কলেজে ডিগ্রিতে ভর্তি হলাম। কাজেই গ্রাম ছাড়তে হলো। রুহিকে ছেড়ে ঢাকায় আসা যে কতো কষ্টের ছিল তা লিখে বোঝাতে পারবো না। ঢাকা আসার আগের রাতে দুইজন নিভৃতে যে কান্না কেদেছি তার কাছে শ্রাবণের ধারাও পরাজয়ের গ্লানিতে ম্লান। প্রতি সপ্তাহে ন্যূনতম একটি চিঠি এবং প্রতি মাসে একবার বাড়ি আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কান্নাকে কোনো রকমে থামাতে পেরেছিলাম।

প্রথম প্রথম প্রতি সপ্তাহে একটি চিঠি দিয়েছি এবং পেয়েছিও। প্রতি মাসে একবার বাড়ি গিয়ে রুহিকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সময়ান্তরে পড়াশোনার চাপে প্রতিশ্রুতির শতভাগ রক্ষা করতে পারিনি। তবে রুহি প্রতি সপ্তাহে চিঠি লিখেছে। ফলে আমাদের যোগাযোগ সব সময় বহাল থেকেছে।

কালান্তরে ডিগ্রি পাস করে চার্টার্ড একাউন্টেন্ট হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে সি.এ ফার্মে ভর্তি হলাম। শিক্ষানবিশ অডিটর হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হিসাব অডিট করার জন্য আমাকে দেশের বিভিন্ন স্থানে যেতে হতো। এতে রুহির সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ বিঘ্নিত হতো। রুহি অভিমানে ঠোট ফুলিয়ে লম্বা লম্বা চিঠি দিতো। নানানভাবে তার অভিমান ভাঙানোর চেষ্টা করতাম।

ইতিমধ্যে রুহি মফস্বলের কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করে। বিয়ের ইঙ্গিত দিয়ে কেমন কেমন একটা চিঠিও লেখে। আমি ক্যারিয়ার গড়ার স্বপ্নে বিভোর ছিলাম বলে তার ইঙ্গিত বুঝেও না বোঝার ভান করি। কিন্তু চোখ বন্ধ করে রাখলে তো আর প্রলয় থেমে থাকে না।

একদিন এলো সেই কঠিন সংবাদটি। রুহি চিঠিতে আমাকে জানালো যে, পাত্রপক্ষ দেখতে এসে তাকে পছন্দ করেছে। সুতরাং বিয়ে অনিবার্য। একমাত্র আমি নাকি তার বাবার সঙ্গে দেখা করে বিয়ে ঠেকাতে পারি। সে আরো লিখেছে, বিয়ে ঠেকানো পরের কথা, চিঠি পাওয়া মাত্র আমি যেন বাড়ি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি।

আমি ছুটে গেলাম বাড়িতে। জীবনসঙ্গী হিসেবে একমাত্র তাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভাবতে না পারলেও ঠিক ওই মুহূর্তে বিয়ে করতে অপারগতার কথা তাকে জানালাম।

রুহি বললো, ঠিক আছে এই মুহূর্তে তোমার বিয়ে করার কোনো প্রয়োজন নেই। তুমি যতোদিন চাইবে ততোদিনই আমি অপেক্ষা করবো। তবে তুমি শুধু একবার বাবার সামনে গিয়ে দাড়াও। তোমাকে কিছু বলতেও হবে না। যা বলার আমিই বলবো।

রুহির এই কাতর অনুরোধটুকুও রাখতে পারিনি। প্রায় ঠিক হয়ে যাওয়া বিয়ে ভেঙে দিয়ে আমি যদি রুহির মতো চমৎকার একটি মেয়ের উপযুক্ত হয়ে উঠতে না পারি এই ভয়ে, এই ভাবনায় গভীর সমুদ্রের দিকভ্রান্ত নাবিকের মতো রুহিকে কিছু না জানিয়েই ঢাকায় চলে গেলাম।

এক সপ্তাহের মধ্যে তার বিয়ে হয়ে গেল।

ঢাকার মেসে একা একা কেদে আমার রাতগুলো কেটেছে। মানুষের চোখ এতো জল ধারণ করতে পারে তা আমার জানা ছিল না। আমাদের এই গভীর প্রেমের করুণ পরিণতির জন্য কাকে দায়ী করবো, আমাকে, না রুহিকে? আমি তো বাংলাদেশের অনিশ্চিত আর্থসামাজিক অবস্থার শিকার, রুহিকে তো দায়ী করার প্রশ্নই ওঠে না।

শরৎবাবুর *দেবদাস*-এর মতো প্রেমিকাকে হারিয়ে তার বিরহে সংসার কর্ম ত্যাগ করে নেশায় ডুবে নিজ জীবনকে ধ্বংস না করলেও কি অসহ্য কষ্ট বুকে ধারণ করে সংসার কর্ম করছি তা আমিই জানি আর জানে একজন যে সবার মনের খবর জানে।

বর্তমানে আমি চট্টগ্রাম ইপিজেড-এ একটি বিদেশি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমার অবস্থানও মন্দ নয়। বিয়ে করার যোগ্যতা অর্জন করেছি বলা চলে। কিন্তু রুহি তো এখন আমার নাগালের অনেক বাইরে। আমি কি এখন ইচ্ছা করলে রুহিকে পেতে পারি?

রুহি ইতিমধ্যে দুই সন্তানের জননী হয়েছে। বাবার বাড়িতে বেড়াতে এলে প্রতিবারই আমার খবর নেয়। বিভিন্ন মাধ্যমে খবর পাঠায় আমি যেন তার সঙ্গে একটু দেখা করি।

দেখা করার সাহস সঞ্চয় করতে পারি না। তাকে দেখে যদি কোনো অস্বাভাবিক আচরণ করি।

হয়তো বিয়েও করবো, সংসারও করবো। কিন্তু রুহিকে কি ভুলতে পারবো? আমার মনের আকাশে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র ধ্রুবতারা হয়ে আজীবন জ্বলজ্বল করে জ্বলবে যে মুখ সে তো রুহির মুখ। মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার হৃদপিণ্ডের ধুক ধুক শব্দে যে নীরব সঙ্গীতটি অতি গোপনে গীত হবে সে তো রুহির সঙ্গীত। যে স্মৃতি রোমন্থন করে আজীবন উজ্জীবিত হবো, ব্যথিত হবো, নীরবে অঝোর শ্রাবণের ধারা সৃষ্টি করবো, সে তো রুহির স্মৃতি।

ছাগলনাইয়া, ফেনী থেকে

ভৌগোলিক সীমারেখা

– দেবী

বাংলাদেশ ও ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক ক্রমেই শিথিল হচ্ছে। হয়তো পত্রিকা সূত্রে এই সংবাদ বেশ কিছুদিন ধরেই পাচ্ছি। যদিও আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত নই তবুও এই আন্তর্জাতিক শীতলতা বরফের শেলের মতো বিদ্ধ করছে আমাকে।

এক ভারতীয় নাগরিক যে জড়িয়ে আছে আমার জীবনের সঙ্গে আজ এখানে তারই কথা বলছি।

জানুয়ারি ২০০০, Universitiy of Iowa, USA–তে আমার এমবিএ ফার্স্ট সেমিস্টার শুরু হয়েছে। তখন আমার এক ক্লাসমেট (ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে একই ডিপার্টমেন্টে পড়ার সূত্রে পরিচয়) আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয় তার সঙ্গে। অবশ্য তার সঙ্গে আমার আগেও দেখা হয়েছিল। একদিন একটা ফর্ম ফিল আপ করার সময়ে একটা ভুল হয়ে যাওয়ায় আমার কারেকশন ফ্লুইড দরকার হয়। আমি ওখানকার অন্যান্য স্টুডেন্টদের মধ্যে কারো এটা আছে কি না জানতে চাইলে সেই আমাকে ফ্লুইড দেয়। সেটা তার দিকে না তাকিয়েই আমি খুব দ্রুত নিয়ে নিই যার জন্য তার হাতে হয়তো আমার নখের আচড় লেগেছিল। এ থেকেই সে ধরে নিয়েছিল আমি অন্য কোনো বাঙালি মেয়ের চেয়ে আলাদা এবং আমার মধ্যে এক ধরনের অস্বাভাবিকতা আছে।

আমি এমনিতে ভীষণ ইনট্রোভার্ট। তাই আমার কখনো কোনো বন্ধু ছিল না। কিন্তু সে আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। আমিও তার সঙ্গে প্রায়ই কথা বলতাম। কিন্তু তার আচরণ এতো আন্তরিক ছিল যে, তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েই গেল। আর তখনই সে আমাকে এই ফ্লুইড–এর ঘটনাটা মনে করিয়ে দিয়েছিল।

পরে আমাকে দ্বিতীয়বার টেস্ট করার জন্য এক থেকে দশের মধ্যে একটা সংখ্যা বলতে বললে বললাম, আট এবং একটা ফুলের নাম করতে বললে বললাম বেলী (Jasmine)।

তারপর সে হাসলো। বললো, স্বাভাবিকরা বলে সংখ্যা পাচ এবং গোলাপ।

এই প্রথম এমন কথা আমার সম্পর্কে শুনলাম, অথচ এতোদিন সবার কাছে শুনে এসেছি, আমি প্রতিভাময়ী। তাই ব্যাপারটা আমার মায়ের কাছে জানতে চাইলাম, আসলেই কোনো অস্বাভাবিতা আছে কি না।

মা বললেন, জিনিয়াসরা একটু পাগল হয়।

আমি এ কথা মেনে নিতে নারাজ। আমার ধারণা, গানের প্রতি তার ভীষণ দুর্বলতা। আমি গান জানি বলেই সে আমাকে পছন্দ করে।

একদিন জিজ্ঞাসা করলে বললো, শুধু গান নয়, তোমার কথা বলার স্টাইল, তোমার ভয়েস, তোমার সব কিছুই ভালো লাগে। সবচেয়ে ভালো লাগে মানুষ হিসেবে তুমি, তোমার স্বতন্ত্র সত্তাকে। এবং খুব সপ্রতিভ ভাবে বললো, বিদেশে মনের কথা শেয়ার করার জন্য তুমি ভীষণ নির্ভরযোগ্য।

নিজেকে সব সময় চিত্রাঙ্গদা ভাবতাম, এখনো ভাবি। তাই তো আয়নায় আমার প্রতিবিম্বের সামনে দাড়িয়ে গুন গুন করি *আমি চিত্রাঙ্গদা।* আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী, নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী। অথচ আমি কখনো ভাবিনি আমার জীবনে কোনো অর্জুনের আবির্ভাব হতে পারে। কিন্তু মানুষ হয়ে জন্মানোর যন্ত্রণা বা সুখ যাই হোক না কেন তা হলো, Always be ready for

uncertainity. আমি যতোই তার সঙ্গে মিশতে লাগলাম ততোই তার মেধা, ব্যক্তিত্ব, সততা, Self control, ম্যানেজমেন্ট পাওয়ার আমাকে মুগ্ধ করতে লাগলো।

আমার অর্জুনের সঙ্গে প্রায়ই তর্ক হতো। যখন বলতাম, আমি কখনো বিয়ে করবো না।

সে বলতো, তুমি বিয়ে না করে পারবে না। একদিন তুমিই কাউকে বিয়ে করার জন্য ব্যাকুল হবে। সব কথাই সে বলতো আত্মবিশ্বাস নিয়ে। আমরা আলোচনা করতাম শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান সব কিছুই ছিল আমাদের আলোচনার বিষয়। এক কথায়, আমার ইন্টেলেক্টের চাহিদা পূরণের জন্য সে অপরিহার্য সব সময়। সারা জীবন হয়তো হবে।

তাকে যায়যায়দিন পড়তে দিতাম। ওয়েবপেজ-এ পড়তো। সে বলতো, তোমাদের দেশের এই পত্রিকার মান ভালো। আমাকেও পড়তে দিতো *দেশ, আনন্দবাজার।*

এভাবে আস্তে আস্তে কখন যে বন্ধুত্বের গণ্ডিটা পেরিয়ে গেছি। আমরা সব সময়েই বলতাম, কাউকে ভালো লাগলে কখনো প্রপোজ করবো না, কখনো মুখেও কিছু বলিনি।

একদিন হঠাৎ আলিঙ্গনে আমি অনুভব করলাম জীবনের প্রথম প্রেম। জীব জগতের মৌলিক চাহিদা। তারপরও নিজেকে সংবরণ করতে চেয়েছি এই ভেবে যে সে বিদেশি এবং আমার বাবা মায়ের আমি একমাত্র মেয়ে।

কিন্তু পারিনি। আমি নিজের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গেছি। আমার তখন ভাবতেই ভালো লাগে, আমি অর্জুনের প্রেমিকা। আমার প্রতিটি সমস্যায় পেয়েছি তার ভালোবাসা মেশানো সমাধান। আমার অসুস্থতায় পেয়েছি আমার ডাক্তারের (ওর) কনসালটেন্সি।

আমি জানি, আমাদের দুইজনের ভালোবাসা যতোটা তারচেয়ে অনেক বেশি পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মান। আমরা চাই না আমাদের আচরণে কারো স্বার্থ ক্ষুণ্ন হোক। আজ ২০০৩ আমরা দুজন দুই দেশে আর একই সঙ্গে অনুভব করছি তীব্র ভালোবাসা এবং হারানোর আশংকা। এক সেকেন্ডের জন্যও তাকে ভুলে থাকতে পারি না যেখানে, সেখানে একটা ভৌগোলিক সীমারেখা আমাদের দুজনের ভেতর দিয়ে চলে গেছে।

আমাদের দুজনের বাবাই দুই দেশের রাজনীতিবিদ। তারা কেউ চান না তাদের সন্তানদের নিজস্ব ভূখণ্ডের বাইরে বিয়ে হোক। এ না চাওয়াই আগ্নেয়গিরি লাভার মতো বয়ে চলেছে। পুড়িয়ে দিচ্ছে ভেতরটা। আমরাও কেউ চাই না বাবা মাকে কষ্ট দিতে। অথচ তারাও আমাদের কষ্টটা বুঝতে চাইছেন না। তারা সংকীর্ণ সংস্কার নিয়ে বসে আছেন।

আমার ভাবতে অবাক লাগে, কার্ল মার্কস, স্বামী বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের মতো পথিকৃৎরাও যুগে যুগে এদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। এখন এই একবিংশ শতাব্দীতেও দুইজন উচ্চ শিক্ষিত মানব-মানবী ভৌগোলিক সীমারেখায় বন্দী। তাই তো সেদিন সন্ধ্যায় সমুদ্রের ঢেউয়ে দাড়িয়ে আমার স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করি, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, *তুচ্ছ বলে যা চাইনি তাই আমাকে দিও।*

ঠিকানাবিহীন

হিন্দি সিনেমা

– শায়লা হক

গল্প লেখা যে কতো কঠিন কাজ তা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। তবুও চেষ্টা করবো লেখার যা আমার মনের সত্য আর অতি বাস্তব ঘটনা। এই সত্য কথাটি আজ পর্যন্ত কাউকে বলতে পারিনি। যদিও বলতাম সেটা কেউ বুঝতে পারতো কি না তাতে আমার যথেষ্ট পরিমাণ সন্দেহ রয়েছে। এখন সেই ঘটনাটি লিখবো।

আমরা ডিশের চ্যানেল যেগুলোতে হিন্দি ফিল্মের অ্যাড দেখানো হয় অনেক নিত্যনতুন ছবি যেমন *না তুম জানো না হাম,* হ্যান ত্যান আরো কতো কি। এই সব ছবিতে মূল কাহিনী হলো প্রেম কাহিনী। এর বেশির ভাগ বোঝানো হয় প্রেম হঠাৎ হয় বা উপরের কেউ আল্লাহ বা হিন্দুদের ভগবান তার জীবনসঙ্গীকে আগে থেকেই তৈরি করে থাকে। যা মানুষ হঠাৎ পরিচয়ে বড় আপন আর কাছের মানুষ ভাবতে থাকে এবং এক সময় প্রেমের ফসল বিয়ে পর্যন্ত গড়ায়।

এমনই এক স্বপ্ন আমিও দেখেছিলাম। হঠাৎ একদিন একটা ফোন নাম্বার পেলাম। আমি কলেজে পড়তাম। ২০০০ সালের ঘটনা। বাসায় ফিরে যখন পড়তে বসলাম, রাফ ব্যবহার করা হয় এমন একটা ডায়রির ভেতরে একটা মোবাইল নাম্বার আর একটা টিঅ্যান্ডটির নাম্বার লেখা। নাম লেখা আরিফ।

এই নাম্বারটা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে বহু জল্পনা-কল্পনা করার পর শেষে ঠিক করলাম, ফোন করবো ওই নাম্বারে। যদিও এ যাবৎকালে এতো বড় হয়েছি কখনো নিজের বাবা যখন বিদেশ থেকে ফোন করতো তখন ছাড়া অন্য কোনো লোকের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি কি না মনে পড়ে না।

এরপর অনেক সাহস করে ফোনটা করেই ফেললাম প্রথমে টিঅ্যান্ডটি-তে। ফোন অনেকক্ষণ বিজি। তারপর সেদিন ছিল জানুয়ারির ২০ তারিখ বুধবার। আমার মেজমামা বাসায় এলেন। মামার মোবাইল দিয়ে আরিফের মোবাইলে ফোন করলাম।

একটা ছেলে ফোনে এতো সুন্দর করে কথা বলতে পারে জানা ছিল না। ছেলেটার কথার মধ্যে এক ধরনের মাধুর্য আছে যা শুনে প্রথম থেকেই অদর্শনে পাগল হয়ে গেলাম।

এরপর ছেলেটার সঙ্গে ফোনেই পরিচয়, ফোনেই কথা।

এভাবে বেশ কিছুদিন কাটলো জানুয়ারি ৩,৪,৫... এভাবে জানুয়ারি গেল, ফেব্রুয়ারি এলো। সবার প্রতীক্ষিত ফেব্রুয়ারি মাস। এতোদিন ধরে যার সঙ্গে কথা বললাম তার সঙ্গে প্রতিটা দিন এক থেকে দেড় ঘণ্টা কথা না বললে ঘুম হারাম হয়ে যেতো। এতো কথা বলা শুরু করলাম যে, সময় জ্ঞান কারোরই ছিল না।

তারপর বেশ কিছু দিন। প্রায় এক মাস হয়ে গেল। আমরা দুইজনে খুব ভালো বন্ধু হলাম। আরিফকে বন্ধু ভাবতাম। সেও আমাকে খুব ভালো একটা বন্ধু ভাবতো। এমন একটা সময় এলো যে, আরিফ তার যতো মনের সমস্যা, আনন্দ-বেদনা সব কিছুর জন্য শুধু আমাকেই অ্যাপৃশিয়েট করতো। এটা যখন বুঝতে পারলাম তখন হঠাৎ বুঝতে পারলাম আমিও তাকে মনে মনে ভালোবাসতে শুরু করেছি। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারি না।

কথায় বলে, *মেয়েদের মন, মুখ ফোটে না।* তবুও মন আনচান করে। আমার কথাটা তাকে বলতে চেষ্টা যখন করলাম তখন দেখলাম ১৪ ফেব্রুয়ারি আসে আসে ভাব। চারদিকে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। মাত্র

একটা দিন পরই ১৪ ফেব্রুয়ারি। মনে মনে কতো জল্পনা-কল্পনা, কিভাবে তাকে আমার মনের কথা বলবো। হঠাৎ একটা মানুষকে তো আর বলা যায় না। আমি তোমাকে ...।

এরপর ১৪ ফেব্রুয়ারি এলো। সে আমাকে সকালবেলা সবার আগে উইশ করলো শুধু বন্ধু হিসেবে। একজন বন্ধু হয়ে আরেকজন বন্ধুকে যেমন করে উইশ করে ঠিক সেভাবেই উইশ করলো।

তাকে থ্যাংকস জানালাম। কিন্তু আমি আমার ভালোলাগার কথাটা তাকে কি করে বলি?

সন্ধ্যায় গেলাম একটা সুপার মার্কেটে। সেখান থেকে শ্রীকান্তের একটা সিডি কিনলাম। সিডি-তে ভালোবাসা সংক্রান্ত একটা গান আছে। আমি ওই গানটা বার বার শুনলাম, খুব ভালো লাগলো। ওই গানটা একটা সিডিতে বার বার রেকর্ড করালাম। এরপর বিরাট একটা গোলাপের তোড়া কিনলাম। গোলাপের তোড়ায় মোট সতেরোটা গোলাপ ১৭ বসন্তের জন্য আর বাকি সব শাদা রজনীগন্ধা। সব কিছু নিজ হাতে তৈরি করলাম। অনেক স্বপ্ন, আদর-যত্ন নিয়ে তৈরি উপহার। আমার সব স্বপ্নের একমাত্র যুবরাজকে অর্পণ করার জন্য গাড়ির ড্রাইভার রাজুকে দিয়ে আরিফের বাসার ঠিকানায় উপহার পাঠালাম।

১৪ ফেব্রুয়ারি। আমার জীবনের স্মরণীয় দিন। রাজুকে দিয়ে আমার ভালোবাসার বার্তা পাঠালাম আরিফকে। শ্রীকান্তের ভালোবাসার গান এবং গোলাপ দিয়ে আরিফকে বোঝাতে চাইলাম তাকে কতো ভালোবাসি।

কিন্তু হায়! আমার স্বপ্ন বিফল হলো। রাজু যখন এলো দেখলাম তার হাতে শুকনো, নুয়ে পরা সতেরোটা গোলাম।

রাজু এসে আমাকে বললো, আরিফ নামের ছেলেটা পলি নামের কোনো মেয়েকেই চেনে না। তাই সে উপহারগুলো নিতে পারবে না।

রাজুর কাছে সব কিছু শুনে এতো দুঃখ পেলাম যে বলার নয়। মনে হলো ছয় তলার ছাদে উঠে আত্মহত্যা করি।

ছাদে গেলাম ঠাণ্ডা হাওয়ায়। মাথায় এলো আরিফ তো আমার আসল নামই জানে না! সে আমাকে শায়লা নামে চেনে। আমার আসল নাম পলি তা সে জানেই না। আমি এই মিথ্যা পরিচয়ের জন্য সব হারালাম। হায় আমার কপাল! এতো বড় ভুল আমি জীবনে করলাম কেমন করে। তবু সান্ত্বনা এই যে, সে এখনো আমার খুব ভালো বন্ধু। কিন্তু এই রহস্যের জাল আমি আজও তাকে খুলে দেখাতে পারিনি। হিন্দি সিনেমার কাহিনী যে আমার জীবনে ঘটবে না, যুবরাজকে হঠাৎ পাওয়া। জীবনসঙ্গীকে খুজে পাওয়া আমার সাধ্য নয়।

হিন্দি সিনেমা, শুধু হিন্দি সিনেমাই।

পল্লবী, ঢাকা থেকে

তেরেসা

– শামীম চৌধুরী

চায়নিজ তরুণী তেরেসা। তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অনেক দিনের। বন্ধুত্ব শুধু মোবাইল এসএমএস-এর মাধ্যমে। একে অপরের সঙ্গে আমাদের কখনো দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। প্রথম শুধু কথা হয়েছিল রং নাম্বার লাইনে। যার থেকে আমাদের এই বন্ধুত্বের উৎপত্তি। আর দেখা না হওয়াটাও একটা অন্য রকমের আনন্দ বলে আমরা উভয়ই মনে করতাম।

মাঝখানে একবার আমার সঙ্গে তেরেসা যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিল। আমার সম্পূর্ণ পরিচয়টি পেয়ে, বিশেষ করে বাংলাদেশি জেনে। স্থানীয় মালাইরা বাংলাদেশি নাম থেকে কেমন যেন চাকর-বাকর একটা গন্ধ পায় আর মালয়শিয়ান চায়নিজরা বিশ্বস্ত চাকর হিসেবেই ভালো জানে বাংলাদেশিদের।

তেরেসা যে একেবারেই যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিল তা নয়। পাচ ছয়টি মেসেজ পাঠালে হয়তো একটির সংক্ষিপ্ত জবাব পাওয়া যেতো এই অবস্থা। বলতে গেলে সেটা ছিল দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্ব হিসেবে সৌজন্যমূলক রিপ্লাই। তেরেসা-র এই অনিচ্ছাকৃত রিপ্লাইয়ে নিজেকে খুব অপরাধী মনে হতে লাগলো আমার।

এক রাতে তাকে মেসেজ দিলাম, আমার মেসেজ পেলে যদি বিরক্ত লাগে তাহলে সরাসরি আমাকে বলতে পারো, আমি কিছু মনে করবো না। কারণ মানুষকে বিরক্ত করা আমার পছন্দ নয়।

মেয়েটির জবাব পেতে দেরি হলো না ওই রাতে। হঠাৎ করে তুমি এমন কথা বললে কেন?

না মানে, অনেকেই সরাসরি কিছু বলতে পারে না, মুখ বুজে সব কিছু সহ্য করে তাই।

আমার সঙ্গে তেরেসা নিয়মিত যোগাযোগ না করতে পারার বিভিন্ন কারণ দেখালো। একটা সত্য ঢাকতে যেমন দশটা মিথ্যা কথা বলতে হয়, অনেকটা সেই রকম অবস্থা।

তাকে মানুষ এবং জগৎ সম্পর্কে অনেক কিছু ধারণা দিলাম।

মেয়েটি যেহেতু শিক্ষিত সেহেতু আমার চেয়ে সেও কিছু কম জানে না। আমার প্রতিটা কথার সে যুক্তি মতো উত্তর দিল। শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করলো, আসলেই কি তুমি বাংলাদেশি?

কেন, বিশ্বাস হয় না? উত্তর দিলাম।

মনে হচ্ছে তুমি একজন হায়ার এডুকেটেড, গ্র্যাজুয়েট।

তিরস্কারের হাসি হেসে বললাম, কেন বাংলাদেশিরা কি গ্র্যাজুয়েট হয় না?

তাৎক্ষণিকভাবে আমার এই প্রশ্নে মেয়েটি হয়তো হতবাক হয়ে গিয়েছিল। কারণ রিপ্লাই পেলাম একটু দেরিতে, হয় না কেন, অবশ্যই হয়। কিন্তু তারা তো আর মালয়শিয়ার মতো দেশে চাকরি করতে আসবে না।

বাংলাদেশ সম্পর্কে তোমার ধারণা একেবারেই কম। গ্র্যাজুয়েট কেন, মাস্টার্স করে অনেকেই বিদেশ যাচ্ছে চাকরির জন্য। বললাম আমি।

এবার মেয়েটি আর কি বলবে হয়তো ভেবে পাচ্ছে না। আবারও রিপ্লাই পেলাম দেরিতে। শামীম, আমি কি তোমাকে একটা রিকোয়েস্ট করতে পারি?

বলো।

আমরা কি একবার মুখোমুখি হতে পারি? অবশ্য যদি তোমার কোনো আপত্তি না থাকে!

আমি মৃদু হাসলাম। এর জবাব দিলাম না। নীরব থাকলাম। নীরবতা সম্মতির লক্ষণ ভেবেই হয়তো তেরেসা দিন, তারিখ, লোকেশন দিয়ে দিল, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, লেক গার্ডেন।

আমার বুঝতে একটুও অসুবিধা হলো না যে ১৪ ফেব্রুয়ারি কেন।

ধার্য করা দিনটির জন্য অপেক্ষা করতে করতে ঠিক তিন দিন আগে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার থেকে কোনো কারণ ছাড়াই আমার সঙ্গে তেরেসা যোগাযোগ বন্ধ করে দিল। এবার পাচ ছয়টি কেন মেসেজের পর মেসেজ দিয়েও কোনো উত্তর পেলাম না। বুঝতে আর বাকি রইলো না। একজন বাংলাদেশির সঙ্গে মন বিনিময় করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সে বড় ধরনের ভুল করেছে এবং সেই ভুলটাই এখন সে বুঝতে পেরেছে। আমিও যোগাযোগ বন্ধ করে দিলাম। হঠাৎ এক রাতে তেরেসার মোবাইল থেকে একটি সংক্ষিপ্ত মেসেজ রিসিভ করলাম। কাল সময় মতো নির্ধারিত স্থানে চলে এসো। সেই থেকেই আমার এ আনন্দের শুরু।

লাল টকটকে একটা গোলাপ নিয়ে সময় মতো নির্ধারিত স্থানে হাজির হলাম। গিয়ে যা দেখলাম তা সত্যিই বিস্ময়কর। হাসবো না কাদবো বুঝতে পারছি না। নিজের কাছে খুবই অপমানিত হলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম একজন ষাটোর্ধ বৃদ্ধা একটা গোলাপ নিয়ে দাড়িয়ে আছে। একবার ভাবলাম দেখা না করে পালিয়ে যাই। কিন্তু সেটা তো ঠিক নয়। নিজেকে প্রবোধ দিলাম, একজন বৃদ্ধাও বন্ধু হতে পারে। কারণ সেও মানুষ। তাছাড়া এমন তো নয় যে, তাকে আমি বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। নিজ মনে শত প্রশ্নের জন্ম দিয়ে মনগড়া সমাধান বের করে বৃদ্ধার সামনে উপস্থিত হলাম। হাসি বের হলো না। তারপরও অনিচ্ছাকৃত খুব কষ্টে একটু মৃদু হাসলাম, হাই...!

তুমি কি শামীম? বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন।

হ্যা সূচক মাথা নাড়লাম, ইয়েস।

গোলাপটা আমার দিকে বাড়িয়ে বৃদ্ধা ডুকরে কেদে উঠলেন।

ব্যাপারটা বুঝলাম না। সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, আমরা একে অপরের বন্ধু। এতে অসুবিধার তো কিছু নেই।

তিনি বললেন, আমি তেরেসার গ্র্যান্ডমাদার। গত বৃহস্পতিবার তেরেসা...। বলেই বৃদ্ধা আবারও কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

আমার বুঝতে একটুও অসুবিধা হলো না যে, তেরেসা কোনো একটা সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছে। তিনি চোখ মুছতে মুছতে আমাকে তার সঙ্গে যেতে ইশারা করলেন। গাড়িতে চেপে দুজনেই রওনা হলাম। পৌছালাম এক চায়নিজ কবরস্থানে। হতবাক হয়ে গেলাম। মোটামুটি আন্দাজ করে ফেললাম ব্যাপারটা কি হচ্ছে। সদ্যনির্মিত শান বাধানো এক সমাধির কাছে উপস্থিত হলাম। এক গাদা আধা শুকনা ফুলে কবরটি প্রায় ঢেকে আছে।

বৃদ্ধা কান্নাজড়িত অস্পষ্ট স্বরে বলতে শুরু করলেন, পেটালিং জায়া থেকে ফেরার পথে রোড অ্যাকসিডেন্ট করে সে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে ট্রান্সফার করা হয় জরুরি বিভাগে। চিকিৎসার কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে আসে। তারপর তোমার ব্যাপারে কিছু কথা বলতে আবারও জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সেই যে জ্ঞান হারালো আর... গভীর কান্নায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি।

অশ্রুতে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। পাথর মূর্তি হয়ে সমাধির পাশে দাড়িয়ে রইলাম।

অপূর্ণ সাধ

– আ.সা.মি

১৯৮৮ সালে এসএসসি পাস করার পর সহপাঠিনী এক আত্মীয়াকে ভালো লেগেছিল। কিন্তু তাকে কিছুই বলা হয়নি। এরপর কেটে গেল কিছু সময়। চৌমুহনী সরকারি এস.এ কলেজে ভর্তি হলাম। লজিং নিলাম গণিপুরে জনৈক কমিশনারের বাড়িতে।

না ফোটা ভালোবাসার কলিকে ফোটানোর জন্য এবার আবির্ভাব হলো সে বাড়ির সালমা আক্তার ননী নামের এক মানবীর। দেখতে সে আহামরি গোছের কিছু নয়। নিম্নবিত্তের ঘরের অতি সাধারণ মেয়ে। তবুও তার স্বতঃস্ফূর্ততায় সত্যিকারভাবেই স্বর্গীয় ভালোবাসা আমার হৃদয়ে কড়া নাড়লো। তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা শুরু করি। কিন্তু আমাদের দুজনের ভালোলাগা, ভালোবাসা কখনো একে অপরকে একটিবারের মতোও মুখ খুলে বলতে পারিনি। চোখের দেখা–দেখি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গের কথাতেই সব সীমাবদ্ধ ছিল। কিছু বই ও ভিউকার্ড দিয়েছিলাম তাকে। এবং তার কথার সূত্র ধরেই একটা চিঠি দিয়েছিলাম যাকে প্রেমপত্র বলা যায়।

একদিন সে হয়তো বা দুষ্টুমি করেই সাঝ বেলাতে আমাকে কিছু ঝাল ফ্রাই করা ছোলাবুট এবং স্টিকারের মতো কয়েকটা ভিউকার্ড দিয়েছিল। অনেক সময় সে আমার উদ্দেশ্যেই সাজতো। মুখে কিছুই বলতো না। সেজেগুজে সামনে দিয়ে হাটতো, বসে থাকতো। সবই বুঝতাম।

আমার সত্যিকারের ভালোবাসার মুকুল তাকে ঘিরেই ফুটতে থাকলো। সে তখন বেগমগঞ্জ সরকারি পাইলট হাই স্কুলে সম্ভবত ক্লাস নাইনে পড়তো। বাস্তবতার কঠিন পরিহাসে আমার ফুটন্ত ভালোবাসার পরিসমাপ্তি এখান পর্যন্ত এসেই থেমে যায়। লজিং ছেড়ে নিজ বাড়িতে চলে আসি।

১৯৯১–৯২ সেশনে চট্টগ্রাম টিটিসি–তে ভর্তি হই। কিছুদিন কালুরঘাট ইস্পাহানি জুট মিলের স্টাফ কোয়ার্টারে ছিলাম। সেখানে বরিশালের জনৈক শ্রমিকের মেয়ে ক্লাস টেনে পড়ুয়া রেহানা চেয়ে থাকতো আমার দিকে অনেক সময়। তাদের পাশের বাসায় টিউশনির সুবাদে আমার সম্পর্কে সে অনেক তথ্য জেনে নিয়েছিল।

একদিন আমার বাসার বারান্দা থেকে তার চোখে চোখ পড়াতে সে আর চোখ নামাচ্ছিল না। আমিও দুষ্টুমি করে নামালাম না। এভাবে আধ ঘণ্টারও বেশি কেটে গেল। জানি না সে কি বলতে চেয়েছিল সেদিন আর আমিই বা কি বললাম। তবে ভালোলেগেছিল তাকে অনেক। ব্যস এ পর্যন্তই। এক সময় স্টাফ কোয়ার্টার ছেড়ে অন্য জায়গায় পড়ার সুবিধার্থে চলে যাই।

এরপর নদীতে অনেক জল গড়ালো। পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফিরে এলাম, ফলাফলের জন্য অপেক্ষা। এরই মাঝে বাবার মামাতো ভাই পুরনো আত্মীয় সউদি থেকে দেশে এলেন। এক পর্যায়ে তাদের পক্ষ থেকেই প্রস্তাব আসে তার বড় মেয়েকে বিয়ে করার জন্য। সরাসরি না করে দিলাম। পরে মা ও

মুরুব্বিদের চাপে পড়ে মত দিতে বাধ্য হলাম। কারণ বাবা মারা যাওয়ার পরে মা বহু কষ্টে আমাকে মানুষ করেছেন। তাই মায়ের মনে দুঃখ দেয়ার কোনো ইচ্ছা ছিল না। শুভ কাজ হয়ে গেল।

বিয়ের দুই দিন পরে স্ত্রীর চেহারা দেখলাম। কারণ বিয়ের আগে কোনো পক্ষের কোনো অভিভাবক প্রয়োজন বোধ করেনি আমাকে কন্যা দেখানোর। আমার আর্থিক অবস্থাও হয়তো বা এর জন্য দায়ী ছিল। বৌকে দেখে তো আমি আকাশ থেকে পড়লাম। জানলাম সে প্রাইমারি গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ। আর একজন মহিলার ন্যূনতম বিধাতা প্রদত্ত যা না থাকলেই নয় সেটা আছে একমাত্র তার কাছে। কি এবং করবো, দোষ কাকে দেবো? কারণ এই নিরপরাধ, মাত্র বারো বছর বয়সের মেয়েকে দোষ দিয়ে কি লাভ? সে তো ইচ্ছা করেই আমার বাড়িতে বৌ সেজে আসেনি। আমি গিয়েই তো তাকে কবুল করে নিয়ে এসেছি।

আগুনের কাছে গেলে মোমের যে অবস্থা হয় সেই অবস্থার কারণে হয়তো বা বিধাতা আমাকে তার গর্ভে একটি মেয়ে সন্তান দিয়েছেন। তার গর্ভেই হয়তো আমার আরো সন্তানাদি হবে। কারণ সেই–ই আমার বিয়ে করা স্ত্রী। আমিও তাকে নিয়েই জীবনের সব কিছু শেয়ার করবো। কিন্তু আমৃত্যু আমি বলে বেড়াবো মন খুলে, তাকে আজো ভালোবাসতে পারিনি। আমার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় তাদেরই কোনো একজনকে পেলে হয়তো বা আমার জীবনকে সার্থক বোধ করতাম। স্বর্গীয় ভালোবাসার সুতায় জীবনকে বুনতে পারতাম। দিনে এনে দিনে খেলেও জীবনটাকে সার্থক ভাবতে পারতাম, কোনো আফসোস থাকতো না। বিধাতা তা কেন হতে দিল না বুঝি না।

আমার স্ত্রী তার সমস্ত আবেগ, অন্তর দিয়েই আমাকে ভালোবাসে। আমি অনুভব করি। আমি লাখোবার চেষ্টা করেছি তাকে সে রকম করে ভালোবাসতে। খোদার কাছে প্রার্থনাও করি আমার হৃদয়ের বন্ধ দ্বার তার জন্য খুলে দিতে। কেননা তার তো কোনো দোষ নেই। কিন্তু আমার হৃদয় থেকে শুধু শূন্যতা বের হয়। জানি না এর কারণ কি, দোষ কাকে দেবো? আমার প্রথম ভালোলাগাগুলোর অকাল মৃত্যুই কি এর কারণ?

আজ আমি আর্থিক, সামাজিকভাবে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত। বিদেশে ভালো বেতনে সম্মানজনক চাকরি করি। বড় শখ ছিল ভালোবেসে বিয়ে করার, ধূলির ধরায় স্বর্গসুখে হৃদয়ে হৃদয় মিলিয়ে বাস করার।

এক জনমে যে সবার ভাগ্যে বোধ করি সব জোটে না। আমার পুরনো ভালোলাগাগুলোকে এই ভালোবাসা দিবসে সেই আগের মতোই ভালোবাসা জানাই! অব্যক্ত মূক, সেই সঙ্গে শ্রদ্ধা জানাই তাদের বর্তমান বাস্তবতার প্রতি। হ্যা, জীবনের কোনো মুহূর্তে তাদের কোনো একজনও যদি নীড়হারা হয়, যদিও আমি চাই না, তাহলে তাকে নীড়ে বেধে নেবো পরম মমতায় সেই আগের মতো করে। জানি না তারা চিনবে কি না, তখন তাকাবে কি না সেই আগের মতো করে।

জেদ্দা, সউদি আরব থেকে

নির্বাচিত

ইংরেজ কবি ইয়েটস তার অজানা প্রেমিকার উদ্দেশে বলেছিলেন :

I will find out where she has gone.
And kiss her lips and take her hands.

কবি ইয়েটস–এর মতো আমিও আমার কল্পনার প্রেয়সীকে খুজে ফিরছিলাম আর কল্পনায় তার হাত ধরে ঠোটে ঠোট রাখতে চাচ্ছিলাম।

বেশি দিন আগের কথা নয়। এ বছরের গোড়ার দিকে শুরু। আমার ঘুম নষ্ট হচ্ছিল প্রায়ই। একদিন, দুই দিন, তিন দিন। সে থাকতো উপরে আর আমি নিচে। দিন যতো যাচ্ছিল, নিজেকে ততোই হেলপলেস মনে হচ্ছিল। ওই সময় সাহায্য করার মতো সত্যিই আমার কেউ ছিল না, অবশ্য এখনো নেই। বুঝতে পারছিলাম, আমার সাহায্য আমাকেই করতে হবে। কারণ খুব বেশি সুস্বাস্থ্য নিয়ে দুনিয়াতে আসিনি। তাই একাধিক রাতের ঘুম নষ্ট করে আমার যতোটুকু স্বাস্থ্য আছে তা নষ্ট করার দুঃসাহস দেখাতে পারবো না। যার জন্য এই ঘুম নষ্ট সেই যদি না জানতে পারলো লাভ কি তাতে। তাকে দেখা সম্ভব হতো কখনো হঠাৎ আবার কখনো চেষ্টা করে।

ভালো লাগতো। তবে দেখামাত্রই যে ভালোবাসায় পড়েছি তেমনটা নয়। তার ওখানে যেতাম। কথা চলতো ভালোই। বিশ মিনিট, ত্রিশ মিনিট, ষাট মিনিট অথবা তারও বেশি। সত্যি বলতে কি, এই মুখোমুখি বসা আর কথা বলাবলির ফলে যা হওয়ার তাই হলো। আমার চূড়ান্ত পতন হলো। রাতে শুতে যাই কিন্তু ঘুম আসে না। শুধু মাথার মধ্যে ঘোরে এই বোধহয় আমার কল্পনার ভেনাস যার হাতে হাত রেখেছি, ঠোটে দিয়েছি চুমু। অবিরাম ঘুমহীন রাত, সে এক অস্বস্তিকর অবস্থা।

এর মধ্যে একদিন কথা বলার ফাকে সে তার কয়েকটা গ্রুপ ছবি আমাকে দেখাচ্ছিল। ছবিতে পরিচয় করে দিচ্ছিল তার সহপাঠীদের। কিন্তু এগুলো আমার মাথায় ঢুকছিল না। আমার চোখ দুটো শুধু তার ছবির দিকেই বিধে যাচ্ছিল। ঘরে এসে ভাবলাম, এভাবে চলতে পারে না। এর একটা পরিণতি আসা উচিত। এরপর কয়েকদিন কেটে গেল। রাত জেগে একদিন তার উদ্দেশে লিখতে বসলাম। বড় চিঠি নয় আবার ছোট্ট চিরকুটও নয়। মাঝারি টাইপের একটা লেখা তাকে দিলাম। যার এক পৃষ্ঠায় ছিল চিরকুটের ভাষা আর উল্টো পৃষ্ঠায় একটা নাতিদীর্ঘ পদাবলী। চিঠির ভাষাটা ছিল এমন –

শোনো মেয়ে,

তোমার জন্য আমার ঠিক তিন রাতের ঘুম নষ্ট হয়েছে। অবশ্য এটা আমার সমস্যা, তোমার নয়। তাই সমাধানটা আমিই করলাম। চিঠির অপর পৃষ্ঠায় তোমাকে নিয়ে একটা কবিতা লিখে দিলাম। কবিতাটা পড়ে তোমার ভেতর দুই ধরনের অনুভূতি জন্মাতে পারে। হয় আমার প্রতি তোমার মন তীব্র ঘৃণায় ভরে উঠবে, না হয় আমার জন্য বিন্দু বিন্দু ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। যেটাই ঘটুক তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। তখন সেটা তোমার সমস্যা। সমাধানটা তুমিই করবে। এই লেখা পড়ে তুমি আমায় ছোটলোক ভাববে, না বড়লোক ভাববে সেটা তোমার ব্যাপার। তবে আমার কথা বলি, আমি তোমার ভালোবাসায় পড়েছি ভীষণভাবে। এবং এই কথাটা তোমার জানা দরকার।

ইতি –

বখাটে/বেয়াদব/খুব ভালো মনের/দুষ্ট/দুঃসাহসী/পচা/ছোট লোক টাইপের/বাজে

একটা ছেলে

উপরের আটটি বিশেষণ থেকে যে কোনোটি আমার জন্য বেছে নিতে পারো।

এরও বেশ কিছুদিন পর তার কাছ থেকে আমার লেখার প্রত্যুত্তরে একটা চিরকুট পেলাম। সেই তার প্রথম লেখা। তার প্রথম লেখায় সে আমার আটটি বিশেষণ থেকে একটি বেছে নিয়েছিল। আর সেই সম্বোধনটা ছিল, *খুব ভালো মনের একজন।*

এরপরের কাহিনী অনেকটা বিস্তৃত। আমাকে সে পাগলের মতো ভালোবাসে এখন। আমিও সেভাবেই বাসি। ভালোবাসাটা বোধহয় পাগলদেরই কাজ। অসহ্য রকম ভালোবাসায় পাগল না হয়ে উপায় কি। এখন তার অভিমান ভরা মিষ্টি অনুযোগগুলো শুনি আর বলি – For God's sake hold your tongue and let me love.

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

যশোর থেকে

চেনামুখ অচেনা মানুষ

– তানিয়া সুলতানা

ভালোবাসা আমাকে ভিখারিনী করেছে এ কথা কখনো বলবো না। আবার ঐশ্বর্যময়ী করেছে সেটাও বলবো না। ভালোবাসা আমাকে শুধু ভালোবাসতে শিখিয়েছে। ফাহিম-এর সঙ্গে দেখা হওয়াটাকে প্রস্তুতিমূলক বলা যায় না, দেখাটা ওই দিন না হলেও কোনো না কোনো একদিন হতো। কারণ ও আমাদের এখানে অফিশিয়াল কাজে এসেছে থাকবে প্রায় ছয় মাস।

সেদিন কলেজ থেকে ফিরে দেখি বাসায় তালা দেয়া। সবাই গেছে বিয়ের নিমন্ত্রণ চাবি সাধারণত পাশের বাসার ভাবীর কাছেই দিয়ে যায়। চাবি আনতে গেলাম। টাকাও ভাঙানোর দরকার ছিল রিকশা ভাড়া দেয়ার জন্য। রিকশা গেটে রেখে দৌড়ে ভাবীর বাসায় ঢুকলাম। খুব দ্রুত টাকা ভাংতি ও চাবি চাইলাম।

ভাবী হঠাৎ বললেন সুমি এটা আমার মামাতো ভাই।

এতোক্ষণে খেয়াল করলাম ঘরে একজন বসে আছে। দেখলাম *দুধে আলতা* গায়ের রঙের একটি ছেলে। তাছাড়া ছেলেদের এই রঙটির প্রতি আমার এলার্জি আছে।

যাই হোক, কুশল বিনিময় করে আবার দৌড় দিতেই শুনতে পেলাম তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলছেন, এযে দেখি কালবৈশাখি ঝড়।

আমার জীবন চলতে লাগলো গতানুগতিক নিয়মেই। কিন্তু হঠাৎ গভীর রাতের একটি ফোন কল আমার সব কিছুই ওলোট-পালট করে দিল।

সাধারণত রাতের কল রিসিভ করি না। কেন যে সেদিন করলাম? তবে এ কথা সত্যি, ওপাশের কণ্ঠস্বরটি আমাকে মুগ্ধ করলো।

এভাবে চললো পাচটি মাস। আর এ কয় মাসেই মনে হলো, না দেখা, নাম না জানা মানুষটিকে ভালোবাসতে শুরু করেছি। কিন্তু সে তো ওই পথই মাড়ায় না। আমি অবলা নারী। কি আর করি। চুপ থাকি।

হঠাৎ সে একদিন শুরু করলো তার ভালোবাসার গল্প। তার ভালোবাসার মানুষকে ঘিরে অসম্ভব সুন্দর সুন্দর কথা। হিংসে হতো, ভীষণ কষ্ট পেতাম। অচেনা সেই মেয়েকে ভাগ্যবতী ভাবতাম। এভাবে সহ্য করলাম অনেক দিন। যাকে ভালোবাসি সে কি না আরেক মেয়ের গল্প রাতভর করে আমারই সঙ্গে। সহ্য করতে না পেরেই একদিন ফোনে খুবই অপমান করলাম। বন্ধ হলো ফোন আলাপ। আবার শুরু হলো অন্য রকম কষ্ট। যতোই যা হোক তারপরও তো ফোনের ওপাশের মানুষটিকে ভালোবেসেছি। খুব নীরবে নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। কারণ যারা নিজ যোগ্যতায় এতোদিন সরাসরি প্রপোজ করেছে তাদেরকে যদি ফিরিয়ে দিতে পারি তবে না দেখা একজনকে ভুলতে পারবো না! নিশ্চয়ই পারবো। এরপর শুনলাম আমার বিয়ের খবর ঘটকালি করছে পাশের বাড়ির সেই ভাবী। আমি কিছুটা বিয়ে বিদ্বেষী। ভাবী এটা ভালো করেই জানেন।

যাই হোক। সবদিক অর্থাৎ পরিবারের কথা বিবেচনা করেই রাজি হলাম। আমি ঘরের খুটি হতে চাইলে কি হবে, কিন্তু বাসার লোকজন আমাকে দিয়ে নয়, গড়ান কাঠ দিয়ে খুটি বানাবে। পাত্র হচ্ছে ভাবীর সেই দুধে আলতা গায়ের রঙের ভাই।

মুরুব্বিদের ফর্মালিটির পর বিয়ে হয়ে গেল। কষ্টের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি আর ভাবছি শেষ পর্যন্ত আমার কপালে এই ছিল, যাকে ভালোবাসলাম তাকে পেলাম না। আর যা অপছন্দ করতাম সেটাই জুটলো কপালে। আবারো খুব নীরবে নিজের ভাগ্যকে মেনে নিলাম।

আজ আমার ফুলশয্যা। সে এলো বর বেশে, আমার হাত ধরে শুনতে চাইলো আমার কথা। আর শুরু করলো তার কথা বিয়ের আগে একটি মেয়ের সঙ্গে সে ফোনে প্রেম করতো মেয়েটি তাকে কি কি বলতো সেসব বলতে লাগলো। আমি অবাক হয়ে শুনতে লাগলাম। কারণ এই কথাগুলো তো আমি এতোদিন ফোনের সেই ছেলেটির সঙ্গে বলেছি। আমার বর আরো বলতে থাকলো, সেই মেয়েটিকে সে প্রচণ্ড ভালোবাসে, তাকে ছাড়া নাকি সে বাচতেই পারবে না। আমার অবাক আর জলে টলমল আখি দেখে সে হেসে ফেললো এবং নিজেই সব খুলে বললো।

প্রথম দেখেই সে আমাকে পছন্দ করেছে। তবে ভাবী অর্থাৎ তার বোনের কাছ থেকে জেনেছে আমার প্রেম ও বিয়ে বিদ্বেষের কথা। তারপরই ফোনের নাটক। আর আমি তো পাওয়ার আনন্দে তাকে আকড়ে ধরে কেদেই চলেছি।

ও আমাকে বুকের মাঝে শক্ত করে চেপে ধরে বললো, তোমাকে আমি কষ্ট দিতে চাইনি। শুধু এতোটুকু বোঝাতে চেয়েছি যে, কারো ঘরে থাকা এবং কারো ভালোবাসা পূর্ণ বুকে থাকা এক কথা নয়। তুমি তো আমার জীবনের প্রথম কালবৈশাখি ঝড় হয়ে আমাকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছো।

খালিশপুর, খুলনা থেকে

ধর্মের দেয়াল

– বাবুল

পুরুষ শাসিত এই সমাজে কার কাছে করবো নালিশ? কারণ আমিও তো একজন পুরুষ। যে সমাজ প্রেমের মধ্যে ধর্মের দেয়াল খাড়া করে দেয়। হ্যা, আমি এই সমাজের কিছু পুরনো ধ্যান-ধারণা, রীতি-রেওয়াজ হীনম্মন্যতার কারণে কিভাবে মানব জীবনে কু প্রভাব পড়ে এবং অকালে জীবন প্রদীপ নিভে যায় তারই একটি ঘটনার কথা লিখছি।

কৈশোরের দ্বারপ্রান্তে যৌবনের ছোয়া সবেমাত্র লেগেছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছে। এমনি এক সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার পল্লী গ্রামের কট্টর হিন্দু পরিবারের এক কিশোরীর প্রেমের উদাত্ত আহবান প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি। আমি মধ্য বাংলার সম্ভ্রান্ত মুসলিম গরিব ঘরের সন্তান, পিতা একজন নির্মাণ শ্রমিক। ১৯৯০-এর শেষ প্রান্তে পিতার কর্মস্থল ওই গ্রামে ছিল। কিশোরীর পিতা আর আমার পিতার কর্মস্থল এক জায়গা হওয়াতে ছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক। দুই পিতার বন্ধুত্বের সম্পর্কই আমাদের প্রেমের সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে সুযোগ করে দেয়।

সব কিছুই চলে সবার অগোচরে। সত্য কখনো গোপন থাকে না। চার বছর পর আমাদের সম্পর্ক প্রকাশ পেয়ে যায়। আমাদের সম্পর্কের মাঝে ধর্মের দেয়াল খাড়া করে দেয় তৎকালীন কিশোরী, আজকের যুবতী অর্থাৎ আমার নায়িকা নয়নের পিতা। তারপরও থেমে থাকেনি আমাদের প্রেমের জোয়ার।

১৯৯৬-এর মাঝামাঝি সিঙ্গাপুর চলে যাই। কিছুদিন থেমে ছিল আমাদের যোগাযোগ। নয়নের প্রচেষ্টায় যোগাযোগ পুনঃস্থাপন হয়। ১৯৯৮ সালের প্রথম দিকে নয়নকে তার মা বাবা জোরপূর্বক বিয়ে দেয়ার চেষ্টায় লিপ্ত। এর মধ্যে নয়ন বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এক বান্ধবীর আশ্রয়ে থাকে। নয়নকে সান্নিধ্য দেয়ার জন্য সিঙ্গাপুরের ভিসা ক্যানসেল করে ১৯৯৮-এর জুলাইতে দেশে আসি। আসার এক মাস পর নয়নের সঙ্গে মিশি এবং বিয়ে করার জন্য নয়নকে ঢাকাতে নিয়ে আসি।

নয়নের বানানো কৃত্রিম প্রতিকূলতার দরুন বিয়ে করতে পারিনি। নয়ন ঢাকা থেকে সরাসরি বাড়ি চলে যায়। তিন চার মাস যোগাযোগ বহাল ছিল।

১৯৯৮-এর শেষ সউদি চলে আসি। অভিমান বলুন বা জিদ বলুন, আসার সময় নয়নকে না বলেই চলে আসি। আসার পর সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগের সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছি। দুই বছর পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়েও কোনো ফল পাইনি। উপায় না পেয়ে আমাদের প্রেমকে মেনে নেয়ার জন্য নয়নের পিতাকে অনুরোধ করেছি। নয়নের পিতাকে এও অনুরোধ করেছি যে, আমাদের প্রেমকে মেনে নিন, বিনিময়ে আপনার যে কোনো শর্ত মেনে নেবো। এছাড়া ধর্মের ব্যাপারে আমার কোনো আপত্তি নেই। যার যার ধর্ম সে সে পালন করবে। আমার পক্ষ থেকে নয়নের কোনো অসুবিধা হবে না। এর গ্যারান্টি হিসেবে নয়নের নামে এক লাখ টাকার ব্যাংক সিকিউরিটি বন্ড রাখবো। নয়ন যদি প্রমাণ করতে পারে যে, আমার পক্ষ থেকে নয়নের কোনো অসুবিধা হয় তাহলে আইনত নয়ন ওই এক লাখ টাকার মালিক হবে।

বিধি বাম। নয়নের পিতা আমার সব অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে দেন। এরপর থেকে মর্মাহত হৃদয় নিয়ে পড়ে আছি রক্ষণশীল সমাজের এই দেশে। মেনে নিয়েছি নিজের ভাগ্যকে।

উপরওয়ালাই জানে, আমার প্রিয়া এখন কার ঘরে আছে। হয়তো বা কোনো যৌতুক লোভীর হাতে হচ্ছে নির্যাতিত। যেখানে নয়নের সুখের জন্য এক লাখ টাকার সিকিউরিটি বন্ড রাখতে প্রস্তুত সেই এক লাখের জন্য হয়তো বা তার জীবন বিপন্ন হচ্ছে।
প্রিয় পাঠকরা আসুন আমরা এই সমাজের পুরনো রীতি–রেওয়াজ থেকে বের হয়ে আসি যেখানে প্রেমের ক্ষেত্রে ধনী–গরিব অথবা ধর্মের দেয়াল খাড়া আছে সেসবকে পিছে ঠেলে দিই। এই সমাজে অনেকের প্রেমের স্বীকৃতি মেলে না, অনন্যোপায় হয়ে জীবন বিসর্জন দিলে ইতিহাসের স্বীকৃতি মেলে। মাঝখানে অকালে হারিয়ে যায় দুটি প্রাণ।
প্রিয়া আমার যেখানেই থাকুক, যার ঘরেই থাকুক তার সর্বাঙ্গীন উন্নতি, উজ্জ্বল সোনালি ভবিষ্যৎ ও ভালোবাসা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে ইতি টানলাম।

দাম্মাম, সউদি আরব থেকে

পরাজয়

– সাদিক

শীতের সকাল। দোতলা ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে দেখছি একটা আহত কাক মাটিতে পড়ে আছে। টোকাই গোছের কিছু ছেলে সেটা নিয়ে বেশ ব্যস্ত। অন্য কাকরাও কম ব্যস্ত না। সবগুলোই কা কা করছে। এর বেশি কিছু করারও নেই তাদের। কাকদের পক্ষে এটা অসম্ভব যে তাদের সঙ্গীকে তারা নিয়ে যাবে। তাই তারের উপর বসে সবাই মিলে এক হয়েই তারা চিৎকার করছে।
মনে হচ্ছে, এ কাকটা দুই তিন মাস আগেও দেখেছিলাম কোনো এক শান্ত দুপুরে। আমার ঘরের পূর্বের এ জানালা দিয়েই কয়েকটা নারিকেল এবং আম গাছের ডালে উড়তে। তবে সেদিন আরেকটা কাক সঙ্গে ছিল। শুধু দুটো কাকই কয়েকটা গাছে উড়তে দেখেছি।
এসব আজেবাজে চিন্তাই এখন আমার প্রতিদিনের, প্রতি মুহূর্তেরই সঙ্গী। কেননা জানালার পাশের এ বিছানা ছাড়া কোথাও একা যাওয়ার সামর্থ আমার নেই। বাড়ির লোকদের কাছে একটা বোঝা হয়ে গেছি। কোনো কাজের দরকার হলেই মা, না হয় ছোট বোনকে ডাকতে হয়। এক বস্তা ওষুধ খেতে হয় সারাদিন। ব্যথা খুব বেশি হলে কখনো ঘুমের ওষুধ। মনে হয় বেশি করে ঘুমের ওষুধ খেয়ে একবারে চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়ি। সব রকম যন্ত্রণা থেকে তাহলে নিষ্কৃতিও পাওয়া যায়।
তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় যখন কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। আসল নামটা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। নামটা দেয়া যায় স্বপ্না। আমার দৃষ্টিতে এটাই তার জন্য যথার্থ। সে ছিল আমাদের এক বছরের ছোট। দুজনেই সেলিমস্যারের কাছে ফিজিক্স পড়তে যেতাম। এসব কথা মনে করতেও এখন ভীষণ কষ্ট হয়। এসব কষ্টের কথা কাউকে বলতেও ইচ্ছা হয় না। পেইনকিলার খেয়ে সারানোও যায় না।
ছাত্র বোধহয় ভালোই ছিলাম। বুয়েটে সিভিলে পড়তাম। সে এক বছর পর ভর্তি হয় ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইকনমিক্স–এ। দেখা করার সুযোগ বেশ ভালোই ছিল। বুয়েট সপ্তাহে দুই দিন বন্ধ থাকে। প্রতি শনিবার বা বৃহস্পতিবার কোথাও না কোথাও বেড়াতে যেতাম। প্রথম প্রথম বাড়ির

লোকজনকে খুব ভয় পেতাম, বিশেষভাবে বাবাকে। পরে বেশ বেপরোয়া হয়ে উঠতে শুরু করলাম। কতো মিথ্যা যে বলতে হতো দুজনেকই। চুরি চুরি করে যখন ফোনে কথা বলতাম, একেক সময় তার কথায় মনে হতো আগামী এক মাস বোধহয় তার বাবা তাকে আর বাসা থেকে বেরই হতে দেবে না। কিন্তু কিভাবে কি হলো, বাড়ি বদলিয়ে কোনো এক কারণে আমাদের এখানেই বাড়ি ভাড়া নিল তারা।

আমার একটা স্বপ্নকে সত্যি করে সে একদিন জানালো তার বড় ভাই আরিফ (বুয়েটে মেকানিকালের ছাত্র, আমার দুই বছরের সিনিয়র) আমাকে চেনে। বড় ভাইয়া নাকি তার বাবা মায়ের সামনে আমার খুব প্রশংসা করেছে। তার মাও আমাকে বেশ কয়েবার দেখেছেন আর বলেছেন, তাদের মেয়ে তাদের দেয়া নামটার যথার্থ মর্যাদা রেখেছে। না, আসল নামটা আমার পক্ষে বলাটা অসম্ভব।

কেউ শক্ত বাধা হয়ে কখনো দাড়াতে পারেনি আমাদের সামনে। ভাবতাম পারবেও না। কিন্তু কথায় বলে, Man proposes, Allah disposes.

এ ডিসেম্বরেই অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা দেয়ার কথা ছিল আমার। সেপ্টেম্বরে যখন বুয়েট পরিস্থিতি অনশনরত একদল ছাত্রকে নিয়ে খুব উত্তপ্ত হলো এবং এক সময় বন্ধই হয়ে গেল তখনকার একদিনের কথা। মোটর সাইকেল নিয়ে গিয়েছি মানিকগঞ্জে মামার বাসায়। রাতে আসার সময়ই ঘটলো আমার জীবনের এ পর্যন্ত ঘটা সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা। বাসটার সঙ্গে কিভাবে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো আমার কিছুই মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে, বাক নিতে গিয়ে বাম হাত, বাম পা আর কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারালাম।

সেই কষ্ট ইদানীং খুব নগন্য মনে হয়। কারণ এর চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট বুকে নিয়ে এখন আমাকে সারাদিন শুয়ে থাকতে হয়। বাম পা-টা এমনভাবে জখম হয়েছে ওটা আর কখনোই ভালো হবে না। নিজের কথা কাউকে বলতেও পারি না। কে শুনবে আমার এসব প্যাচাল!

আসল কষ্টটা শুরু হলো যখন প্রথম কয়েকদিন হাসপাতালে আমাকে দেখতে আসার পর সপ্তম দিন থেকে স্বপ্নার আসা বন্ধ হলো। প্রথমে ভাবতাম শুধু শুধুই এতো কষ্ট পাচ্ছি। ওর হয়তো কোনো সমস্যা। তাই আসতে পারেনি। কিন্তু ক্রমেই দুঃস্বপ্নকে সত্য করে আমার সঙ্গে সে একেবারে যোগাযোগ বন্ধ করে দিল। কখনোই বিশ্বাস করি না, স্বপ্না আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় না। সে এ রকম মেয়েই না।

বন্ধুবর সজীবের কাছে শুনলাম তার বাবা মা তাকে ঘর থেকে বের হতেই দেয় না। আমারও তার সঙ্গে যোগাযোগ করার সে রকম মাধ্যমই এখন নেই। এখন শুধু মনে পড়ে তার সঙ্গে কাটানো বিভিন্ন সময়ের কথা। বিশেষ করে শেষবার যখন দেখলাম সেই সময়টা। যাবার আগে শুকনো হাসিমুখে বললো, ভালো থেকো।

ক্যাবিন থেকে বের হওয়ার দরজায় গিয়ে যখন কাধের ওপর মুখ ঘুরিয়ে বললো, আসি। তখনো ভাবিনি এভাবে তাকে হারাতে হবে।

ওর বাবা-মা ওর ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে খুবই ব্যস্ত। তাই কোনো রকম কলংক যেন গায়ে না লাগে সে জন্য এখনই তারা তার বিয়ে দিতে ইচ্ছুক। আমারও তো এখন আর সে অবস্থা নেই যে, নিজের

যোগ্যতার চ্যালেঞ্জ ছুড়ি। বাবা–মা তো কখনো অপকার চান না। তার আসল উপকারই ওর বাবা–মা করছেন। তাই আমিও তার খোজ নিই না।

বুঝি আমি এখন পরাজিত, বিধ্বস্ত। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের গল্প পড়িনি। তবে তার The old man and the sea মুভিটি দেখেছিলাম। শুনেছি এ গল্পের শেষে ওনার মতামত ছিল, Man can be destroyed but cannot be defeated. আমার মনে হয়, তিনিই এটা বিশ্বাস করতেন না। করলে কখনোই এভাবে পৃথিবী ছেড়ে যেতেন না।

এদিকে সজীব জানালো, এ কুরবানির ঈদে আরিফভাই অস্ট্রেলিয়া থেকে আসবে এবং ঈদের পরে তার বিয়ে হবে।

কল্যাণপুর, ঢাকা থেকে

পেয়েও হারালাম

ডেইজিকে প্রথম দেখলাম ড্রেস পরে স্কুল থেকে আসতে। দেখেই কিছুটা আশ্চর্য হলাম এই ভেবে যে, এতো চমৎকার একটি মেয়ে আমাদের পাশের বাসায় থাকে, অথচ এর আগে কখনো তাকে দেখিনি। এরপর থেকে তাকে দেখার জন্যই তাদের স্কুলের ছুটির সময় আমাদের বারান্দায় এসে দাড়াতাম।

ডেইজির ব্যাপারটা আমার এক বন্ধুকে বলতেই বললো, আরো কয়েকজন ছেলে নাকি তার পেছনেই ঘুরছে।

বাসা দুজনের পাশাপাশি হওয়াতেই শেষ পর্যন্ত সম্পর্কটা আমার সঙ্গে হয়ে যায়। বেশ চমৎকার একটি মেয়ে ছিল ডেইজি। তার বাবা ছিলেন একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। ডেইজি তার বাবার খুব আদরের মেয়ে হওয়াতে তার সব আবদারই তার বাবা রক্ষা করতেন।

ডেইজি আমাকে একদিন বললো, তুমি কি আমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে পারবে?

তখন ডেইজিকে প্রচণ্ড ভালোবাসতাম। অবস্থা এমন ছিল, সে বললে সারাদিন রোদের মধ্যে দাড়িয়ে থাকাটাও কোনো ব্যাপার ছিল না। ডেইজির বাবার সঙ্গে দেখা করলাম তাদের বাসাতেই।

আমাকে দেখার পর ডেইজির বাবা বললেন, ডেইজি মাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। তোমারও পড়ালেখা শেষ হয়নি। তোমরা এমন কিছু করো না যাতে দুই পরিবারের সম্মান নষ্ট হয়। আমাকে আরো বললেন, আমি অবশ্যই ডেইজির ইচ্ছার মূল্য দেবো।

ডেইজির কোনো আবদারই তার আব্বা ফেলবেন না। এর জন্যই হয়তো আমার মতো একটি সাধারণ ছেলেকে তার আব্বা মেনে নিয়েছিলেন। ডেইজি আমাকে ভীষণ ভালোবাসতো।

একবার ঢাকার বাইরে যাবো। ডেইজিকে বললাম, তুমি একটা বড় চিঠি দিও যাতে ভ্রমণের পথটা তোমার চিঠি পড়েই কাটিয়ে দিতে পারি।

ডেইজি আমাকে ষোল পাতার এক বিশাল চিঠি লেখে।

এভাবেই তার সঙ্গে আমার সুন্দর দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। কখনোই ভাবিনি তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে যেতে পারে। ডেইজি আমাকে প্রচণ্ড বিশ্বাস করতো।

একদিন তার বাসায় কেউই ছিল না। আমরা দুজন কয়েক ঘণ্টা খাটের ওপর পাশাপাশি শুয়েছিলাম। এক পর্যায়ে আমাদের শরীরে কোনো কাপড় ছিল না। দুজনই ছিলাম জন্মদিনের ড্রেসে। তারপরও আমরা নিজেদের সংযত করেছি। আমার কয়েকজন বন্ধুকে বলেছিলাম, ডেইজির সঙ্গে আমি জন্মদিনের ড্রেসে এক খাটে ছিলাম। কিন্তু কিছুই করিনি।

এই কথা শুনে আমার কোনো বন্ধুই বিশ্বাস করেনি। আমার বন্ধুদের ধারণা কোনো মানুষই ওই অবস্থা থেকে ফিরে আসতে পারে না।

ডেইজি তার বান্ধবীদের বলেছিল। তার বান্ধবীদেরও একই ধারণা।

ডেইজিকে বলেছিলাম, আমরাই একমাত্র যুগল যারা জন্মদিনের ড্রেস পরেও নিজেদের সংযত রাখতে পেরেছিলাম।

সেই থেকে আমার প্রতি ডেইজির বিশ্বাস আরো বেড়ে যায়।

এরপরের ঘটনা খুব দ্রুত গড়িয়ে যায়। আমার আব্বা কেন জানি ডেইজিকে অপছন্দ করতে থাকেন। আমাকেও বলা হয় আমি যেন ডেইজির কাছ থেকে সরে পড়ি।

ডেইজির সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দিই। আমার সঙ্গে ডেইজি যোগাযোগের চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু আমিই এড়িয়ে চলতে থাকি।

এক পর্যায়ে ডেইজির কাছে ফোন করে বলি, আমি একটা নষ্ট ছেলে। রেগুলার নেশা করি। তুমি আমার চেয়ে অনেক ভালো ছেলে পাবে।

সে শুধু বললো, আমার কি কোনো দোষ ছিল?

কোনো উত্তর দিতে পারিনি। শুধু বলেছিলাম, আমি তোমাকে ছাড়তে পারবো। কিন্তু ফেনসিডিল ছাড়তে পারবো না।

সে বলেছিল, আমি তোমাকে ভালো করবো।

বললাম, সম্ভব না।

আমার কলিগরা বলে, এতো ভালো একটা মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করা ঠিক হয়নি। আমিও জানি তার মতো চমৎকার মেয়ে জীবনে পাবো না। মাঝে মধ্যে যায়যায়দিনে যখন চমৎকার কোনো প্রেমকাহিনী পড়ি তখন আফসোস লাগে, আমারও যদি এই রকম একটি লাভার থাকতো! পরক্ষণেই ভাবি, এর চেয়েও মিষ্টি একটি মেয়ে আমার জীবনে ছিল যাকে আমিই সরিয়ে দিয়েছি।

নিজের কাছেই প্রশ্ন করি, আমার জীবন তো এমন হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু কেন এমন হলো!

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

শ্রেষ্ঠ

– রিয়া

বাবার বন্ধুর ছেলে। সেই সুবাদেই সে আমাদের বাড়িতে আসতো। সে দেখতে যেমন ছিল তেমনি ছিল কথা–বার্তা ও মনমানসিকতায় আট দশটা ছেলের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। এবং কারণে তাকে খুব ভালো লাগতো। অবশ্য সে ভালোলাগার পেছনে বিশেষ কোনো কারণ ছিল না বলে সে কেন আসে তা কখনো জানতে ইচ্ছাও করেনি।

কয়েক বছর আগে এমনই একদিনে প্রথম সে আমাকে ভালোবাসা সংখ্যা পাঠায়। তাতেই তার একটা ছোট্ট লেখা পড়ে প্রথম জেনেছিলাম আমার প্রতি তার গভীর ভালোবাসার কথাটি। তার লেখা পড়ে আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না এমন একজন ব্যক্তিত্ববান সুপুরুষ কিভাবে আমার অজান্তে আমাকে এতোটা ভালোবাসতে পারে। ভাবতে অবাক লাগে যে, যখন আমাদের বাড়িতে আসতো তখনকার তার কথা বা কাজকর্মে কখনো বুঝতে পারিনি আমার প্রতি সে যে এতোটা দুর্বল। এবং তিল তিল করে আমার অজান্তে আমাকে সে অতোটা ভালোবেসে ফেলেছে।

কিছুদিন পরেই সে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। প্রতিদিনই সে আমাকে দুই তিনটা করে চিঠি পাঠাতে থাকে। সেই চিঠিগুলোতে এমনভাবে ভালোলাগা, ভালোবাসা আর সুন্দর সুন্দর সব স্বপ্নের কথা লিখেছিল যা পড়ে আমিও কেমন যেন স্বপ্নে বিভোর হয়ে গিয়েছিলাম।

আমার পরিবারটি ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। ব্যাপারটা যেহেতু আমার। তাই পরিবার থেকে পুরো ব্যাপারটা আমার মতামতের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়।

কি করবো বা আমার কি করা উচিত ভেবে পাচ্ছিলাম না। আবার এদিকে আমার ইউনিভার্সিটির অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা। উপায়ন্তর না দেখে তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলি। যে মানুষটাকে কখনো অন্য কিছু ভাবিনি, অথচ সেদিন সারাটা জীবনের একান্ত কিছু ভাবনা নিয়ে তার মুখোমুখি হয়েছিলাম। বেশ কিছুটা সময় কথা বলে কেন জানি তাকে খুব কাছের এবং একান্ত আপন বলে মনে হয়েছিল। এও মনে হয়েছিল, আসলেই সে খুব ভালো মানুষ। তার ওপর নির্ভর করা যায়। যে কারণে তখন তার ভালোবাসার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারিনি।

আমাদের বিয়ে হয়েছে আজ প্রায় তিন বছর। এরই মধ্যে ইউনিভার্সিটি জীবন শেষ করে একটা ব্যাংকে চাকরি করছি। স্বামী এবং ছোট্ট সোনামানিকটাকে নিয়ে নিজের আলাদা সংসারে বেশ ভালোই আছি। আমার বিরাট অংকের ব্যাংক ব্যালান্স নেই। বাড়ি, গাড়ি নেই। তবে আমার সংসারে আছে পাহাড় পরিমাণ সুখ শান্তি আর অনেক অনেক ভালোবাসা।

বিয়ের পর প্রতি বছরের এদিনটায় সে আমাকে দামি শাড়ি বা দামি গহনা দেয় না। অফিস থেকে ফেরার পথে এক গোছা রজনীগন্ধা আর একটি ভালোবাসা সংখ্যা নিয়ে আসে যা আমাকে বার বার মনে করিয়ে দেয় আমার প্রতি তার প্রথম *ভালোবাসার* কথাটি। সে কারণে এটিই আমার ভ্যালেনটাইনস ডে–র শ্রেষ্ঠ উপহার।

পশ্চিম রামপুর, ঢাকা থেকে

পরামর্শ

– এম.এম ওবায়দুর রহমান

মানুষের জন্মগত অভ্যাস, সে অন্যকে প্রভাবিত করতে চায়। সে চায় তাকে সবাই ভালোবাসুক। পৃথিবীর অন্য কোনো প্রাণী সম্ভবত মানুষের মতো এতোটা ভালোবাসার কাঙাল না। আবার মানুষের ভালোবাসাটাও বড় বিচিত্র। তারা গোত্র–গোষ্ঠি, ধর্ম–অধর্ম, ধন–দৌলত, সুন্দর–অসুন্দর খোজে না। কেবল ভালোবাসাই খোজে। যাকে ভালো লাগে তাকে চাই–ই চাই। কিন্তু চাইলেই কি সব পাওয়া যায়? বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা সম্ভব হয় না। তাই মনের মানুষকে না পেয়ে অনেকেই *দেবদাস* সাজে। কেউ কেউ অবশ্য আরো এক ধাপ এগিয়ে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয়। এতে অপরপক্ষের তেমন ক্ষতি হয় কি? তারচেয়ে জেনে নিন, প্রিয়জনকে কিভাবে প্রথম জানাবেন হৃদয়ের কথা।

সে যদি কিশোর- কিশোরী হয়

এই বয়সের ছেলেমেয়েরা বেশ চঞ্চল থাকে। সব কিছুতেই এদের সীমাহীন কৌতূহল। তবে ভালোবাসার ব্যাপারে এরা বেশ সিরিয়াস। তারা চায় কেউ একজন তাকে ফলো করুক, ভালোবাসুক। তাই এদের সঙ্গে প্রেম করা বেশ সহজই বলবো। প্রথমে যে কোনো উপায়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। তাকে সময় দিন। মাঝে মধ্যে তার চোখের দিকে তাকান। গভীর দৃষ্টির পর একটু হাসুন। অপরপক্ষ যদি এতে সায় দেয় তাহলে সংক্ষিপ্ত করে রহস্যময় শব্দে জানিয়ে দিন হৃদয়ের কথা ছোট চিঠিতে। নিজে চিঠি পৌছাতে না পারলে তার বিশ্বস্ত কোনো বন্ধু বা বান্ধবীর সহায়তা নিতে পারেন।

সে যদি কলেজ ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া হয়

আপনাকে পোশাকে–আশাকে, কথা–বার্তায় অবশ্যই স্মার্ট হতে হবে। ক্লাসের সহপাঠীদের সঙ্গে ভালো রিলেশন রাখুন। সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে অল্প হলেও জড়িয়ে পড়ুন। যাকে ভালো লাগে তার সঙ্গে পরিচিত হন। আর হ্যা সহপাঠীদের মধ্যে এমন ধারণা বিলিয়ে দিতে পারেন যে, আপনার কাছে কঠিন সাবজেক্টগুলোর সুন্দর নোট রয়েছে। যেভাবেই হোক নোট সংগ্রহ করুন। বিশেষজনের পোশাকের প্রশংসা করুন। তাকে সময় দিন।

সব সময় মনে রাখবেন, চোখ মনের আয়না। তাই যদি মুখে বলতে দ্বিধা হয় তাহলে চোখে চোখে দিন জানিয়ে...। অথবা খুব স্বাভাবিকভাবেই একদিন বলে ফেলুন ভালোবাসার কথাটা!

সে যদি হয় কারো স্বামী- স্ত্রী?

পরকীয়া অথবা স্বকীয়া বুঝি না। প্রেম প্রেমই, তাই না? অতএব দ্বিধা কেন? প্রিয়জনকে সময় দিন। তার দাম্পত্য জীবনের অভাব অনুযোগগুলো খুজে বের করুন। তাকে মাঝে মধ্যে এটা–সেটা গিফট দিন। নিরাপদ স্থানে এবং নিরাপদ সময়ে দেখা করুন। কথা বলুন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। আপনার প্রতি বিশ্বাসের জন্ম দিন তার মনে। সে যেন নির্ভর করতে পারে আপনাকে। ফাংশন, নাটকে যেতে

পারেন তাকে নিয়ে। নির্জনে তার সায় পেলে হাত স্পর্শ করতে পারেন অথবা তার চেয়েও বেশি। ইনডাইরেক্টভাবে তাকে জানিয়ে দিন হৃদয়ের কথা।

সম্পর্ক স্থায়ী করতে চাইলে

মনের মানুষকে বশে এনেছেন, এখানেই সব শেষ নয়। সম্পর্ক স্থায়ী করতে চাইলে নিচের কথাগুলো মেনে চলুন।

● তোমাকে ছাড়া বাচবো না অথবা তুমি আমার প্রথম প্রেম ইত্যাদি কমন বা নাটকের ডায়ালগ দেবেন না।

● তার বিশেষ কোনো হবি থাকলে তাতে উৎসাহ দিন।

● যথাসম্ভব সম্পর্কের ব্যাপারটা গোপন রাখুন।

● কথা দিলে অবশ্যই রাখতে চেষ্টা করুন।

● কথা কাটাকাটি লাগলে কখনো জিততে চাইবেন না। সে অভিমান করলে নিজেই উদ্যোগ নিয়ে তা ভেঙে ফেলুন।

● বিভিন্ন দিবসেই কেবল নয়, মাঝে মধ্যেই প্রিয়জনকে গিফট দিন।

● কখনো সন্দেহ করবেন না, বরং প্রিয়জনকে বিশ্বাস করুন।

● হাতের কাছেই তার একটা ছবি রাখুন।

● প্রিয়জনের ভাইবোনসহ ফ্যামিলির সবার প্রশংসা করুন।

● ই-মেইল, ফোন, এটা-সেটা যাই থাকুক, মনে রাখবেন, চিঠির সঙ্গে কোনো কিছুরই তুলনা হয় না। তাই চিঠি লিখুন।

● প্রিয়জনের বিশেষ কিছুর যেমন তার হাসি অথবা চোখ বা ঠোটের প্রশংসা করুন।

● ভালোবাসায় শারীরিক স্পর্শের বিকল্প নেই। তাই সময় সুযোগ পেলে হৃদয়ের পাশাপাশি শরীরকেও অংশগ্রহণ করতে দিন ভালোবাসায়। তাকে আদর করুন।

শিবচর, মাদারীপুর থেকে

আড়াল

– মোহাম্মদ সারোয়ার আলম শামীম

আমার জেঠাতো ভাই প্রচুর পয়সা-কড়ির মালিক হলেও একদিক দিয়ে ছিলেন নিঃস্ব। তার প্রথম স্ত্রী বছর খানেক আগে তাকে নপুংসক সার্টিফিকেট দিয়ে চলে গেছেন। তারপরও এমন পয়সাওয়ালা একজন লোকের ঘর আর কতোদিন স্ত্রী শূন্য থাকতে পারে?

পাত্রী পছন্দের পর ঘরে আনা হলো এক অনিন্দ্য সুন্দরী বৌ। আমার প্রথম থেকেই মনে হতে লাগলো এ সংসারও মনে হয় বেশি দিন টিকবে না। আর ভাবীর জন্য আমার দুঃখ হতো, মনে মনে ভাবতাম এমন সুন্দরী একটা মেয়ে যদি দরিদ্র ঘরে না জন্মাতো।

বিয়ের কিছুদিন পর থেকে ভাবী ও আমার মাঝে আন্তরিক একটা সম্পর্ক গড়ে উঠলো। বলে রাখা ভালো, আমার পরিবারের সবাই ঢাকা থাকায় বাড়িতে একা থাকতাম। এইচএসসি পরীক্ষা দেয়ার জন্য আমাকে বাড়ি রেখে আসা হয়েছে। যেহেতু একা থাকতাম সেই সুযোগে ভাবী দিনে অন্তত একবার হলেও আমার রুমে আসতেন। বিভিন্ন ধরনের রসালো আলাপের পাশাপাশি ভাবী তার স্বামীর নামে অনেক অনুযোগ, অভিযোগ পেশ করতেন। দিন যতোই গড়াতে লাগলো এ সীমানা ক্রমেই অতিক্রম করতে লাগলাম। এক সময় বুঝতে পারলাম তার প্রতি ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছি। তাকেও দেখেছি অনেকবার আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে।

জিজ্ঞাসা করলে বলতেন চেয়ে থাকতে আমার ভালো লাগে তাই চেয়ে থাকি।

একদিন সাঝের বেলায় আমার রুমে এসে বললেন, শামীম, তোমার ভাই কি একটা কাণ্ড ঘটিয়েছে জানো?

না তো।

এসো, আমার ঘরে এসে দেখে যাও।

কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। ঘরে ঢুকতেই ভাবী তার ব্লাউজ দেখিয়ে আমাকে বললো, এমন টাইট ব্লাউজ জীবনে কাউকে পরতে দেখেছো? তোমার ভাইয়ের যা কাণ্ড না, দেখো তো হাত দিয়ে।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার দিকে এগোলাম। গলার নিচের অংশটায় দুই আঙুল চালাতেই আমার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। হঠাৎ তার শাশুড়ির ডাকে দুজন সংবিৎ ফিরে পেলাম। যাবার আগে আমাকে বলে গেলেন, বৈশাখী মেলা আগামী ১১ বৈশাখ। মেলার দিন রাতে এসো। ওই দিন তোমার ভাই সারা রাত মেলায় থাকবেন।

এ কথা শোনার পর আমার সারা শরীর অবশ হয়ে যাওয়ার যোগাড়। হিসাব করে দেখলাম ১১ তারিখ আসতে আরো পাচ দিন বাকি। পাচটা দিন আমার কিভাবে কেটেছে তা প্রকাশ করার ভাষা আমার কলমের নেই।

যাই হোক। ১১ বৈশাখ সন্ধ্যাবেলা ভাবী আরো একবার আমার কাছে এসে বললেন, কি, মনে আছে তো? ঠিক রাত একটায়। আমি দরজা খুলেই রাখবো।

রাত একটায় প্রকৃতি যখন সমস্ত নীরবতা নিয়ে অঝোর ঘুমে বিভোর তখনো জেগে আছি আমি। কল্পলোকের প্রেয়সীকে আজ কাছে পাওয়ার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা আমায় বার বার মোহময় করে তুলছে। দরজা খুলে ভালোভাবে লক্ষ্য করলাম, আশপাশে কেউ আছে কি না? তেমন কাউকে দেখা গেল না। বলে রাখা প্রয়োজন, তখনো আমাদের বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি পৌছায়নি। মোটামুটি অন্ধকার হাতড়ে ভাবীর দরজার সামনে গিয়ে দাড়ালাম। আবারও ভালোভাবে চার পাশ বুলিয়ে নিলাম। এবার আস্তে করে দরজায় ধাক্কা দিলাম।

কিন্তু একি! দরজা বন্ধ! ভাবলাম ঘুমিয়ে পড়েছেন হয়তো। তাই চাপা স্বরে তাকে ডাকতে লাগলাম, ভাবী, এই ভাবী।

কোনো সাড়া–শব্দ পেলাম না। পাচ সাত মিনিট একটানা তাকে ডেকেই চলছি, কোনো প্রত্যুত্তর পাচ্ছি না। রাগে, ক্ষোভে আমার শরীরের সমস্ত লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে। এবার তাকে আরো একটু জোরে ডাকাডাকি করছি।

ভাবী, এই ভাবী, এ রকম ফাজলামোর কোনো মানে হয় না, দরজা খোলো।

ততোক্ষণে ভেতর থেকে উত্তর পেলাম, কে ওখানে?

তবে ভাবীর নয়, আমার জেঠাতো ভাইয়ের কণ্ঠ। আমার তো তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। একি ওর মেলায় থাকার কথা। কিন্তু এখানে কেন! তাহলে দশ পনেরো মিনটি যাবৎ আমি যা বলছি সবই তিনি শুনেছেন। টের পেলেন নাকি আমাদের সম্পর্কের কথা?

যাই হোক। ওই সময় ত্বরিত একটা উত্তর দিয়ে চলে এসেছিলাম ঘরে। দিয়াশলাই নেই। তাই ওনার কাছে এসেছিলাম একটা ম্যাচের জন্য। কে জানে কতোটুকু বিশ্বাস করেছিলেন। পরদিন লজ্জায়, দুঃখে তাদের কারো সামনে দাড়ানোর সাহস পাইনি। একদিন পরই ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

কিছুদিন পর খবর নিয়ে জানতে পারলাম তাদের দুজনার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম, একি আমার কারণেই, নাকি ছাড়াছাড়ির মূলে রয়েছে আমার জেঠাতো ভাইয়ের নপুংসকতা। যদি আমার কারণে হয়ে থাকে তাহলে নিজেকে কিভাবে ক্ষমা করবো? ভাবী, তুমি তো আমাকে ক্ষমা চাইবার সুযোগটাও দিলে না।

কবিরপুর, সাভার থেকে

সে

পৃথিবীতে তাকে এবং যাযাদিকে খুব ভালোবাসি, বিশ্বাস করি। কারণ তার সৌন্দর্য, স্মার্টনেস, রুচিবোধ আর যাযাদির সত্যবাদিতা ও নিরপেক্ষতা প্রেমে পড়ার মতো। অর্থাৎ আমার প্রেমিক দুজন। সে এবং যাযাদি।

১৯৯৪ সালে আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। আমরা কয়েকজন ঠিক করলাম প্রাইভেট পড়বো। আমার এক ভাইকে বললাম একজন টিচার জোগাড় করার জন্য।

দুদিন পর ভাইটি বললো, আগামীকাল তোদেরকে পড়াতে আসবে, তোরা স্কুলের একটা রুমে বসিস।

কাছেই ছিল প্রাইমারি স্কুল। পরদিন আমরা বসলাম। আমরা জানতাম না, আমাদের কে পড়াবে, দেখতে কেমন। তাই আমরা এ নিয়ে গবেষণা শুরু করলাম। এক পর্যায়ে বললাম যে, আমি কোনোদিন শিক্ষকের সঙ্গে প্রেম করবো না।

হঠাৎ দেখলাম একজন সুদর্শন যুবক আমাদের দিকে আসছে। এসে বললো, আমি তোমাদের পড়াবো। তারপর তার পরিচয় দিল। বললো, পড়াশোনা শেষ করেছে, এখন বেকার, তাই আমাদের পড়াতে চায়।

প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে গেলাম। এবং একটু আগে আমি যে কথাটি বান্ধবীদেরকে বলেছিলাম তার জন্য মনে মনে আফসোস করলাম।

যাহোক, এভাবেই চলতে লাগলো। আমার ভালোলাগা ভালোবাসায় রূপ নিল। কিন্তু তাকে বললাম না। কারণ সে যদি আমায় ফিরিয়ে দেয় এই ভয়ে এবং ভদ্র মেয়ে হিসেবে আমার একটা পরিচিতি ছিল।

এরপর আল্লাহর অশেষ রহমতে তার চাকরি হলো ১৯৯৫ সালে এবং চলে যাওয়ার আগে সে আমাকে বললো, কেউ যদি কিছু খোজে আর তা তোমার মাঝে পেয়ে যায় তাহলে তুমি কি করবে?

এতোদিন পর আমার ভালোবাসার মানুষের মুখে এ কথা শুনে কেদে ফেললাম।

১৯৯৬ সালে পারিবারিক সম্মতিতে আমাদের বিয়ে হয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

বদরগঞ্জ, রংপুর থেকে

লেসন টোয়েন্টি- ফোর

– রাশেদুজ্জামান রানা

আমার স্ত্রীকে এখন যে শিক্ষাটা দিচ্ছি সেটা চব্বিশতম। অসুখ বুঝে চিকিৎসা, এর আগেরটা অর্থাৎ লেসন টোয়েন্টি থৃ ছিল মাত্র পাচ দিনের। পার্ট ছিল দুটি। পার্ট ওয়ান তিন দিনের এবং পার্ট টু ছিল আরো কম মাত্র দুই দিন।

দুর্মুখেরাও বলবেন, আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে রোমান্টিক কাপল, সব কিছু শেয়ার করি।

ধরুন, সে ভাঙলো দুটো কাপ, সঙ্গে সঙ্গে আমি ভাঙবো দুটো পিরিচ।

ও ঘুসি মারলে আমি থাপ্পড়, সে যদি আমার বাম হাত ধরে তবে আমাকে ধরতে হবে তার ডান হাত।

তারপর হাতে হাত রেখে বেরিয়ে পড়বো আমরা ঘুরতে।

এরপরও লেসন টোয়েন্টি ফোর–এর প্রয়োজন হয়েছিল।

কেন?

সেই শানে নযুলটাই এখন বলবো।

সারাদিন চাকরি–বাকরি নিয়ে ব্যস্ত থাকি। বৌকে ভালোবাসি না, বেশি বেশি সময় দিই না। এসব অভিযোগ ছিল আমার স্ত্রীর। তাই তার জন্য আমার ভালোবাসা প্রমাণ করতে বসকে পটিয়ে কয়েকদিনের ছুটি ম্যানেজ করে ফেললাম।

ভেবেছিলাম ঘরে বেশি সময় দেবো। কিন্তু সেটাই যে কাল হবে কে জানতো?

সারাদিন লেপকাথা মুড়ে ঘরে থাকি। খাই–দাই ঘুমাই টিভি দেখি। আশপাশের কেউ দেখছে না নিশ্চিত হয়ে বৌয়ের পেছনে ঘুর ঘুর করি।

দুই দিনের মাথায় দেখি আমার স্ত্রী মহাবিরক্ত, *তোমার কি অন্য কোনো কাজ–কাম নেই?* মুখের ওপর বলেই ফেললো সে।

যার লাগি চুরি করি, সেই বলে চোর। দেখুন অবস্থা! ফলে এক রকম বাধ্য হয়েই লেসন টোয়েন্টি ফোর–এর খসড়া করে ফেললাম মনে মনে।

সেদিনই ক্যালভিন ক্লাইন–এর দামি পারফিউম মেখে সন্ধ্যায় পরিপাটি হয়ে বের হলাম। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরে রাতে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর–এ ঢুকে ছোট একটি *জেসমিন* কিনে পুরোটাই ব্লেজারে স্প্রে করে বাসায় ফিরলাম।

বৌ সন্দিগ্ধ চোখে আমাকে বললো, তোমার গায়ে মেয়েমানুষ–এর গন্ধ কেন?

রাতে সে অন্য পাশ ফিরে শুলো।

পরের সন্ধ্যায় বন্ধু সোবহানের বাসায় বিরাট আয়োজন সকল বন্ধু–বান্ধবের জন্য। কয়েক বছর যাবৎ প্রতি শীতে অন্তত একবার হাসের মাংসের সঙ্গে ঘিয়ে ভাজা পরোটার একটা আয়োজন থাকে তার বাসায়। সঙ্গে পশ্চিমি পানীয়। বন্ধুদের চাপাচাপিতে আমিও কয়েক পেগ হুইস্কি গলায় চালান দিলাম। পার্টি শেষে রাত সাড়ে বারোটায় নিজের বাসায় ফিরে দেখি আমার স্ত্রীর চোখ দিয়ে আগুনের হলকা বের হচ্ছে।

বাড়ি ফেরার আর দরকার কি ছিল? যার সঙ্গে ফুর্তি–টুর্তি করলে তার কাছে যাও। মুখ ঝামটা দিয়ে আমার সকল অনুনয়–বিনয় উপেক্ষা করে পাশের রুমে ঘুমাতে গেল সে।

পরের দিন রাস্তায় বের হয়েই টের পেলাম আমার গতিবিধির ওপর নজর রাখা হচ্ছে। ফেউ আর কেউ না, আমারই ছোট শ্যালক সুজন মিঞা। সে নিরাপদ দূরত্বে হন্ডা চালিয়ে আমার রিকশার পেছন পেছন আসছে। রিকশা চালককে বললাম, ভাই, আপনাকে পাচ টাকা বেশি দেবো যতো আস্তে পারেন ততো আস্তে চালান।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রিকশার পাশে সুজনকে দেখতে পেলাম। রিকশা ছেড়ে দিয়ে সুজনের পেছনে হন্ডায় চেপে বসলাম। গন্তব্য পিৎসা হাট।

পিৎসাভক্ত শ্যালক আমার দুর্গতির কথা শুনে ইতিমধ্যেই প্রেমে পড়লেও শেষ পর্যন্ত বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। সে গিয়ে তার বোনকে কি বললো কে জানে?

সে রাতে পাশের রুমে *আমার সংসার ভাঙলো রে* – এ জাতীয় বিলাপে আমার ঘুম হলো না এক ফোটাও।

পরের দিন রিকশায় উঠেই খেয়াল করলাম পেছনে একটা রিকশায় পিছু নিয়েছে স্বয়ং আমার স্ত্রী। আমার ছুটি আর বেশি নেই। লেসন টোয়েন্টি ফোর নিয়ে দ্রুত একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে টু বি কন্টিনিউড অর নট টু বি কন্টিনিউড।

এদিকে *কল্লোল পরিবহন* থেকে ঢাকা–চট্টগ্রাম–কক্সবাজার–টেকনাফ–সেন্ট মার্টিন ভ্রমণের একটি প্যাকেজ ছেড়েছে। রিকশাকে কল্লোলের কাউন্টারের দিকে ঘোরাতে বললাম। আমার স্ত্রী আমার পিছু পিছু ঢুকলো কাউন্টারে। ভিড়ের জন্য একটু পেছনে পড়ে রইলো সে। নার্ভাস ভঙ্গিতে জটলার দিকে তাকিয়ে আছে। ভাবছে, ভাগছি আমি দূরে কোথাও তাকে না জানিয়ে।

অনেক কষ্টে পাশাপাশি সিটের দুটো টিকেট পেলাম। সমস্যা অবশ্য একটা হয়েছে যে, বাসের টিকেট পেলাম সেটা পনেরো মিনিটের মধ্যেই ছাড়বে।

যখন ভিড় গলিয়ে রিনির দিকে এগিয়ে তার হাত ধরলাম, অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নিল সে।

চোখ মোছো বোকা মেয়ে, সেন্ট মার্টিন যাচ্ছি আমরা এই বাসে। আমি বললাম।
মনে হলো, সে কিছুই বুঝতে পারছে না।
ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলো।
ধাতস্থ হয়ে বললো, তোমার কি মাথা খারাপ?
হ্যা। বললাম আমি।

সাউথ খুলশী, চট্টগ্রাম থেকে

স্বামী- পিতা- পুত্র

– সাশা

ডাইনিং টেবিলে কনুইয়ে ভর দিয়ে হাতের তালুতে কপালটাকে ঠেস দিয়ে বসে আছে রাশাদ। চোখের কোটা দিয়ে মায়ের কাণ্ডকারখানা দেখছে। বসে আছে সে অনেকক্ষণ। সাড়ে চার বছরের এই ছোট্ট শিশুটিকে যারা চেনে তারা জানে, দুই দণ্ডের জন্যে বসে থাকা ছেলেটির জন্য কতো কঠিন।
প্রবাসী স্বামীর সঙ্গে কর্মরত রফিকভাই দেশে ছুটি কাটিয়ে ফিরে যাচ্ছেন কর্মস্থলে। আজ রাতেই ওনার ফ্লাইট। হাতে একদম সময় নেই। স্বামীর জন্য অতি যত্নে কেনা উপহারগুলো ভালোভাবে প্যাক করে পৌছে দিতে হবে রফিকভাইয়ের কাছে। জিনিসগুলো সব ছড়িয়ে আছে টেবিলে। রাশাদের আম্মু শাহীনা প্যাক করতে করতে আরেকবার জিনিগুলো দেখে নিলেন।
সামনে ঈদ। তাই আড়ং থেকে একটা সিল্কের পাঞ্জাবি কিনেছেন। লম্বা–চওড়া, হ্যান্ডসাম তার স্বামীকে পাঞ্জাবিটা কেমন মানাবে মনে করে পুলকিত হলেন। এছাড়াও তার পাঠানোর তালিকায় আরো রয়েছে শুকনো খাবার যা তার স্বামীর বিশেষ পছন্দ। প্রিয় লেখকের বই, সিডি ইত্যাদি।
তবুও মন ভরছে না শাহীনার। হাজার মাইল দূরে থেকে আর কেমন করে স্বামীকে ভালোবাসা জানাবেন ভেবে আকুল হলেন। রাশাদের বয়স যখন মাত্র আড়াই বছর তখন তার প্রিয় মানুষটি শেষ এসেছিল দেশে। বাবার কোনো স্মৃতিই তৈরি হলো না ছেলেটার মনে ভাবলেন তিনি। তার চিন্তায় ছেদ পড়লো।
রাশাদ কথা বলতে শুরু করেছে, মা এগুলো এতো শক্ত করে প্যাকেট করছো কেন?
ভালো করে প্যাকেট না করলে জিনিসগুলো নষ্ট হয়ে যাবে পাপ্পা। তখন এগুলো তোমার আব্বু আর পাবেন না। রাশাদকে তিনি আদর করে পাপ্পা ডাকেন।
এগুলো কেমন করে বাবার কাছে পৌছাবে মা?
তোমার রফিক আংকল পৌছে দেবেন।
এই যে হালুয়া রান্না করে পাঠাচ্ছো, এটাও বাবার কাছে পৌছে যাবে?
হ্যা, এটাও পৌছে যাবে।... খেলতে যাও তো পাপ্পা, বিরক্ত করো না।
আচ্ছা মা, আমাকেও এ রকম প্যাকেট করে বাবার কাছে পাঠানো যায় না?
শাহীনা স্থির চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

শশী

– মোহাম্মদ হযরত আলী

ভরা দুপুরে পিয়ন এসে কতোকগুলো চিঠি দিয়ে গেল। একটি চিঠিতে প্রেরকের ঠিকানা নেই। বুঝলাম, এটি শশীর চিঠি।

শশী আমার মেয়ে। ক্লাস নাইনের ছাত্রী।

চিঠি লেখার ক্ষেত্রে শশীর নিজস্ব একটা স্টাইল আছে। তা হলো, কাউকে সে চিঠি লিখলে খামের ওপরে সে তার নাম–ঠিকানা লেখে না। এক্ষেত্রে তার বক্তব্য হলো, হৃদয় যখন হৃদয়কে বুঝতে পারে তখন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। অতএব প্রাপক আর প্রেরকের মধ্যে যদি হৃদয়ের বন্ধন পোক্ত থাকে তাহলে খামের ওপরে প্রেরকের ঠিকানা লেখার তেমন আবশ্যকতা নেই।

এ নিয়ে গত এক সপ্তাহে শশী আমাকে সাতটি চিঠি লিখেছে। প্রতিটি চিঠিতে সে একটি কথাই বার বার তুলে ধরেছে। বাবা, হাসিনার ভেঙে দেয়া কাটা আবারও গজিয়েছে। সে বিষাক্ত কাটার আঘাতে বিপর্যস্ত হচ্ছে নাগরিক জীবন। শংকিত সময় কাটাতে বাধ্য হচ্ছে খালেদা। ড. কামাল, ইনু আর মেনন যেন হাসিনাকে নীরব সমর্থন দিচ্ছে। বাবা, তুমি তাড়াতাড়ি এসে একটা কাজ করো। না হলে *হাসিনা সন্ত্রাসে* নাগরিক জীবনে সমস্যা বাড়বে ছাড়া কমবে না। হ্যা বাবা, তুমি বাড়ি ফেরার সময় দুটো গরম কাপড় কিনে এনো। পাশের বাড়ির বুড়ো নানি এবং তার শিশু নাতিটা শীতে খুব কষ্ট করছে।

শশীর একিউরিয়াম–এ আনুমানিক পচিশ প্রজাতির প্রায় দেড়শ মাছ আছে। অধিকাংশ মাছই দেশি। ওই মাছগুলো থেকে নিরীহ প্রকৃতির মাছগুলোকে *নাগরিক মাছ* নামকরণ করে শশী অবশিষ্ট প্রতিটি মাছের একটি করে নাম রেখেছে। তার ওই নামের তালিকা থেকে খালেদা, হাসিনা, এরশাদ কিংবা কাদের সিদ্দিকী কারো নাম বাদ পড়েনি। নামগুলো মাছের শান্ত, উগ্র এবং সুবিধাভোগী আচরণের ওপর ভিত্তি করে শশী রেখেছে।

আচার–আচরণ, স্বভাব–চরিত্র আর মেধা ও মননে মেয়েটা হয়েছে তার মায়ের মতো। কখনো কোনো কারণে যদি তার উপর রাগ করি তাহলে আমার সে রাগ ভাঙানোর জন্যও ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সুযোগ বুঝে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির মতো আমার সামনে এসে দাড়ায়। কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে দাড়িয়ে থেকে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে, সরি বাবা, রাগ করেছো?

তখন আর আমার রাগ ধরে রাখতে পারি না।

ঠিক করেছি বাড়িতে গিয়ে প্রথমে একিউরিয়াম থেকে শিং মাছটি তুলে ফেলবো। কিন্তু তার আগেই শশীর একটি ফোন পেলাম। ফোনে শশী কাতরকণ্ঠে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, বাবা, তুমি কেমন আছো?

আমি শশীর প্রশ্ন শুনে আতকে উঠলাম। কারণ কারো সার্বিক অবস্থা জানার জন্য শশী কখনো কাউকে কেমন আছো প্রশ্নটি করে না। কারো সার্বিক অবস্থা জানার জন্য শশীই তার কাছে যায় এবং বাস্তব সম্মত কথাবার্তা বলার মধ্য দিয়ে সে নিশ্চিত হয় লোকটি ভালো আছে, নাকি খারাপ আছে।

শশীর বিশ্বাস, কারো সার্বিক অবস্থা জানতে চেয়ে কেমন আছো প্রশ্নটি করা উচিত নয়। কেমন আছো প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতা ভদ্রতার খাতিরে হলেও বলবে ভালো আছি। এতে প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতা উভয়েরই কাছে দায়সারা রূপে প্রকাশ পাবে। এবং উত্তরদাতা ভদ্রতার খাতিরে ভালো আছি বললে সেটা মিথ্যার চর্চা করবে। উভয় প্রবণতাই মানব জীবনের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে।

বাড়ি ফিরে শুনি, শশী হাসপাতালে ভর্তি। গতকাল স্কুল থেকে বাসায় ফেরার সময় একজন অন্ধ লোককে বাচাতে গিয়ে রিকশা অ্যাক্সিডেন্টে শশীর একটি পা ভেঙে গেছে। হাসপাতালে গিয়ে দেখি একজন অন্ধলোক শশীর শিয়রে বসে তাকে কমলা খাওয়াচ্ছে।

অন্ধ লোকটির কমলা খাওয়ানো কৌশল একজন স্বাভাবিক মানুষের মতো দেখে কিছুটা অবাক হলাম। এবং লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি চোখে দেখেন না, তবু কেমন করে ঠিক ঠিকভাবে মুখে কমলা তুলে দিচ্ছেন?

লোকটি আমার প্রশ্ন পাশ কাটিয়ে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো, আসসালামু আলাইকুম। আপনি বোধহয় শশীর বাবা। আসুন, এখানটায় এসে বসুন।

আমি আরো অবাক হয়ে বললাম, বুঝলেন কিভাবে আমি শশীর বাবা?

শশী লোকটির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হেসে জবাব দিল, বাবা হৃদয় যখন হৃদয়কে বুঝতে পারে তখন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।

ইসলামপুর, ধামরাই থেকে

অনুভবে

– মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান মিঞা

আমার বয়স ৮০ বছর।

প্রথম যৌবন পদার্পণে ২০ বছর বয়সে বিয়ে করি ১৩ বছর বয়সের এক কিশোরীকে।

বেশ ভালোভাবেই পাচটি বছর কেটে যায়। তারপর আমার সঙ্গিনীর হয় অকাল মৃত্যু। তখন আমি ২৫ বছরের এক টগবগে যুবক।

তার মৃত্যুর কথা মনে হলে আজও বুকটা ব্যথায় কেপে ওঠে। কিছুদিন পর নিজের নিঃসঙ্গতাকে দূরে ঠেলে দেয়ার প্রয়াসে দ্বিতীয় বিয়ে করি। আবার ফিরে পাই আগের আনন্দ মিশ্রিত দিনগুলোর মতো সোনালি দিনের ঝলক।

এভাবে কাটতে থাকে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর।

গত বছর অর্থাৎ ২০০২ সালের শেষের দিকে আবার সঙ্গিনীকে হারাই। দীর্ঘ ৫৫ বছর ঘর সংসারের মায়াজাল ছিন্ন করে সে আমাকে একা রেখে চলে যায় পরলোকে। বেশ কিছুদিন নিজেকে যে কি অসহায় মনে হয়েছে তা আমি ছাড়া আর অন্য কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।

যাহোক, এখন আমার বয়স ৮০ হলেও মোটেও বৃদ্ধ নই। শারীরিক সুস্থতা ও ক্ষমতায় আমি ২০ বছরের যুবকের মতো না হলেও ২৫ বছরের যুবকের চেয়ে কোনো অংশে কম নই। মানসিক দিক দিয়েও যুবকের আসনেই রয়েছি। আমার একাকীত্ব ঘোচানোর প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে লক্ষ্য করছি।

এ প্রয়োজনের তাগিদেই ইতিমধ্যে আমার তৃতীয় বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। মেয়েটা দেখতে খুব সুন্দরী। বলা চলে অনন্যা সুন্দরী, বয়স ২৫ বছর।

আমার কথা মতোই বিয়ের তারিখ ১৪ ফেব্রুয়ারি ধার্য করা হয়েছে।

নিজেকে এখন অতি ভাগ্যবান মনে হচ্ছে। আমার অন্তর সাগরে ভালোবাসার যে নিবিড় প্রবাহ তা বাসর বসন্তে দুজনে ভাগাভাগি করে নেবো। হয়তো বা সেও আমাকে এখন খুব অনুভব করছে। অনুভবে দুজনের দিনগুলো এখন ভালোই কাটছে। মিলনমেলায় দেখা হবে ১৪ ফেব্রুয়ারিতে। বরযাত্রী হিসেবে থাকবে আমার ছয় মেয়ে-জামাই ও নাতি-নাতনিসহ তাদের ছেলেমেয়েরা।

তানোর, রাজশাহী থেকে

অসম্ভব

– মঙ্গল

এই মঙ্গল, একটু শুনে যা।

আলোর কথা শুনে খেলা ফেলে ছুটে এলাম। সে আমার চেয়ে দুই বছরের ছোট। কিন্তু সম্পর্ক বন্ধুর মতো।

এসো আমরা বিয়ে বিয়ে খেলি।

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, বিয়ে বিয়ে মানে?

আলো একটু হাসি দিয়ে বললো, আয় তো। সিনেমাতে দেখে শিখেছি কিভাবে একা একা বিয়ে করতে হয়।

আমি এক অজানা কৌতূহল নিয়ে তার সঙ্গে গেলাম। সিনেমার স্টাইলে আমরা একা একা বিয়ে করলাম। বাসরঘর করবো বলে একটি নির্জন ঘরে ঢুকলাম।

ঘরে ঢুকে আলো বললো, আমি খাটে বসে থাকবো, তুই এসে... হিঃ হিঃ।

তার কথা মতো আমি তার পাশে গিয়ে বসে ভাবছি এরপর কি করতে হবে।

আলো বিরক্ত হয়ে বললো, তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। বলেই আমার ঠোটে ঠোট ঠেকিয়ে চুমু খেতে লাগলো।

কি করবো, আমিও পাল্টা জবাব দিচ্ছি এমন সময় বাইরে কার পায়ের শব্দ। কি আর করা, দুজন দুই দিকে দে ছুট।

এভাবেই শুরু।

আর এটাই আমাদের জীবনে কাল হয়ে দাড়িয়েছে।

আমাদের এ সম্পর্কই তার চোখের নিচে কালি পড়ার কারণ, আমাকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করার কারণ। ছোট বেলায় যদি বুঝতাম তাহলে কোনোদিনও আমরা পরস্পরের সঙ্গে মিশতাম না। কেননা আমাদের সম্পর্কটা সমাজ কখনো মেনে নেবে না। সে আমার খালা। মামির বোন। আমরা কতো চেষ্টা করেছি বিচ্ছিন্ন হতে। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস। যতোই চেষ্টা করি ততোই বন্ধন সৃষ্টি হয়। এ জন্য আমাদের মানসিকভাবে লাঞ্ছনা শুনতে হয়। আমরা একে অন্যের সঙ্গে বেশি কথা বলি। এটা আমাদের পরিবার দেখতে পারে না। আবার কথা না বললেও দোষ। স্বাভাবিকভাবে কথাও বলতে পারি না। মাঝে মধ্যে মনে হয় আত্মহত্যা করি। পারি না।

তার জীবনে আমিই একমাত্র পুরুষ। আর না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আমিও অন্য মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারিনি, বরং অন্য মেয়ে দেখলে আমার তাকাতেও ঘৃণা হয়।

গত ঈদে সে আমাদের এখানে ছিল। আমি তাকে একটু দেখা করার কথা বললাম। সে কোনো কথা না বলে চলে গেলে আমি বললাম, আলো, তোমার কিছু হয়েছে?

সে ফুপিয়ে উঠে বললো, এখন এই কথা বলছি। এর জন্যও কতো কথা শুনতে হবে।

আমি কি করবো, বাইরে এসে সিগারেট খাওয়া আর আকাশ দেখা ছাড়া কিছুই করার নেই। অনেকবার ভেবেছি তাকে নিয়ে পালিয়ে যাবো। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভেবে যাওয়া হয় না।

কিছুদিন আগে তার কথা ভাবতে ভাবতে কেবল ঘুমিয়েছি। কিছুক্ষণ পর মনে হলো কেউ আমার বুকের ওপর শুয়ে আছে। চোখ খুলে দেখি আলো আমার বুকে মাথা রেখে কাদছে।

আমি বললাম, আলো, এই সময়ে তোমার এখানে আসা ঠিক হয়নি।

আলো কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো, আমি আপনাকে কেমন ভালোবাসি জানি না। তবে মনে হয় আপনাকে না পেলে বাচবো না।

আমার চোখ ছলছল করে উঠলো। অনেক কষ্টে কান্না থামিয়ে বললাম, আলো, তুমি হয়তো আমাকে খুবই ভালোবাসো। আমি জানি আমার চেয়েও বেশি। কিন্তু একটা কথা বলছি, কারো জন্য কারো জীবন থেমে থাকে না। একদিন আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো। জীবন থেমে থাকবে না। সুতরাং অমন কথা বলা ঠিক না।

তবে আপনি কেন সব সময় মনমরা থাকেন? খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে শুধু সিগারেট খান?

যে কারণে তুমি শুকিয়ে যাচ্ছো। আলো, আমাদের আরো মানসিকভাবে শক্ত হতে হবে। আমাদের মেনে নিতে হবে আমাদের সম্পর্ক কখনোই সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদের উচিত হবে শিগগিরই আমাদের সম্পর্ক ভেঙে ফেলতে। কারণ এটা পাপ, এটা অনুচিত।

আলো হাসার চেষ্টা করে বললো, আপনি পারবেন?

আমি হেসে ফেলে বললাম, চেষ্টা করতে দোষ কি। একটা কথা বলছি, যদিও এটা মহাঅন্যায় তবুও বলছি, আমি তোমাকে আমার স্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছি। আমাদের মিলন এ জগতে সম্ভব নয়। দেখি পরকাল কি করতে পারে।

আলো বললো, কেন আমাদের এর আগে একবার বিয়ে হয়নি?

আলোর কথা শুনে আমি হাসতে শুরু করলাম। ভাবছি স্রষ্টা কেন আমাদের এভাবে সৃষ্টি করলো যেখানে আমাদের সম্পর্কটা অসম।

রেবেকা

– সুলতানুল ইসলাম

বছরটি হবে ১৯৬৮ কিংবা ১৯৬৯ সাল। তখন আমি সদ্য ডাক্তারি পাস করে রাজশাহী মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে চাকরি করি। যথারীতি একদিন সকালে রাউন্ডে গিয়ে দেখি আঠারো উনিশ বছরের একটি ফুটফুটে অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে মেঝেতে বিছানায় শুয়ে। কর্তব্যরত নার্সকে কারণ জিজ্ঞাসা করতেই জানতে পারলাম, মধ্য রাতে অতিমাত্রায় ঘুমের বড়ি খেয়ে অজ্ঞান অবস্থায় মেয়েটি হাসপাতালে আসে এবং তখন বিছানা খালি না থাকাতে অস্থায়ী ব্যবস্থা।

যাহোক, দুপুর নাগাদ একটি বিছানা খালি করে মেয়েটিকে বিছানা দেয়া হলো। বিকেলে রাউণ্ডে গেলে মেয়েটির মায়ের সঙ্গে পরিচয় হলো। অত্যন্ত ধনাঢ্য পরিবার এবং এই জমজিমা সংক্রান্ত বিরোধে প্রতিপক্ষের গুলিতে ভদ্রমহিলা তার স্বামী হারিয়েছেন। তবে অত্যন্ত উগ্রমেজাজি এবং দেমাগী ভদ্রমহিলা। মেয়েটির নাম রেবেকা। নামের সঙ্গে এবং পোশাক আশাকের অপূর্ব মিল মানে সবই আধুনিক। জিজ্ঞাসা করলাম, ঘুমের বড়ি কেন খেলে।

জবাবে বললো, মরতে চেয়েছিলাম তাই। কিন্তু ডাক্তারেরা বাধ সাধলো, আবারও খাবো।

কথায় কথায় জানতে পারলাম তার মা অত্যন্ত রগচটা। কথায় কথায়, সামান্য কারণে বকাঝকা করেন। অভিমানী মেয়ের তা সহ্য হয় না। যাহোক, আস্তে আস্তে রেবেকা সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলো আর আমি অসুস্থ মানে প্রেমরোগে আক্রান্ত হলাম। এবং এই সংক্রামক রোগে রেবেকাও আক্রান্ত হলো। ডিউটি ছাড়াও হাসপাতালে সময় কাটাতাম এবং রেবেকার জন্য ছোটখাটো জিনিস নিয়ে যেতাম। এ নিয়ে হাসপাতালে নানান কথা হতে লাগলো। এর মাঝে রেবেকা সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছাড়ালেও তার এক মামির সঙ্গে প্রায়ই সন্ধ্যায় হয়তো বা হাসপাতালে অথবা আমার ডাক্তারদের কোয়ার্টারে বেড়াতে আসতো।

রাজশাহী ছেড়ে দেশের বাড়িতে যাবার আগের দিন সন্ধ্যায় রেবেকার সে কি কান্না! আমার বুকে মাথা রেখে প্রতিজ্ঞা করলো, আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে সে বিয়ে করবে না এবং আমিও শপথ করলাম, তাকে ছাড়া বিয়ে করবো না।

কালের আবর্তে সব চোখের জল, সব শপথ ভুলে অন্য মেয়েকে বিয়ে করলাম।

নিয়তির কি পরিহাস! গত কৃসমাসের আগে এখানকার এক শপিং মলে রেবেকার সঙ্গে হঠাৎ দেখা। তার কথায় জানলাম, ১৯৯২ সালে স্টুডেন্ট ভিসাতে আমেরিকা এসে ইনটেরিয়র ডেকরেশনে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে এখন সে এক আমেরিকান কম্পানিতে উচু বেতনে চাকরি করছে। লং আইল্যান্ডে বাড়ি কিনেছে এবং একাই থাকে।

কথায় কথায় সে বললো, আমি এখনো অপেক্ষা করছি। আর তুমি?

আমার বেইমানি এবং বেইমানির সাজা হিসেবে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন সবই তাকে খুলে বললাম।

দুঃখ করো না, মানুষের সব সাধ পূরণ হয় না। শান্ত স্বরে সে বললো। তারপর বাসার ফোন নাম্বার দিয়ে বললো, একদিন সময় নিয়ে বাসায় এসো। তোমার কথা আমি শুনবো আর আমার কথা তুমি। বাইরে তখন প্রচণ্ড তুষার বৃষ্টি আর হিমেল হাওয়া।

নিউ ইয়র্ক থেকে

দায়িত্ব

– মুকুল

চট্টগ্রাম গিয়েছিলাম মামার বাসায় বেড়াতে। বেশ কয়েকদিন বেড়িয়ে নিজেদের বাসা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফেরার দিন মামা তার ড্রাইভারকে একটা গাড়ি দিয়ে পৌছে দিতে বললেন। সঙ্গে দিলেন ইন্টারমিডিয়েট পড়ুয়া মামাতো ভাইটিকে। কুমিল্লা এসে বিরাট জ্যামে পড়লাম। দুইপক্ষের সৃষ্ট মারামারিতে একজন খুন হওয়ার প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে রেখেছে।

প্রায় পাচ ঘণ্টা আটকে থাকার পর যখন গাড়ি চলতে শুরু করে তখন রাত সাড়ে এগারোটা। বারোটার দিকে গাড়ি আবার থামলো। কি ব্যাপার জানতে চাইলে ড্রাইভার বললো, পুলিশ।

দেবিদ্বার থানার সামনে গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞাসা করে বিস্তারিত জানার পর পুলিশ বললো, এতো রাতে আপনাদেরকে আমরা একা ছেড়ে দিতে পারি না। আমার দিকে তাকিয়ে বললো, রাস্তা আপনার জন্য নিরাপদ নয়।

আমি বললাম, আর মাত্র সামান্য পথ। অসুবিধা হবে না।

ডিউটি অফিসার বললো, আপনি জানেন আর সামান্য পথ! বি–বাড়িয়া যেতে আরো দুই ঘণ্টা সময় লাগবে।

বললাম, আমি কোনো অসুবিধা ফিল করছি না।

অফিসারটি বললো, আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। ড্রাইভারকে গাড়ি থানার ভেতরে নিতে বললো।

আবার বললাম, তাহলে আমাদের সঙ্গে পুলিশ দিন।

অফিসারটি বললো, আমাদের লোকবল কম। তাছাড়া নিয়ম নেই। সকাল পর্যন্ত আপনাদেরকে থানায় থাকতে হবে।

ড্রাইভারকে গাড়িতে ঘুমোতে বলে আমাদের দুইজনকে থানার ভেতরে নিয়ে গেল। দুই রুমের দুটি ঢেলনিতে আমাদের দুজনকে ঘুমোতে দিল। অফিসারকে বললাম, কাইন্ডলি ওই ঢেলনিটাও এখানে আনার ব্যবস্থা করুন, আমরা দুইজন এক রুমে থাকতে চাচ্ছি।

সে বললো, সম্ভব নয়।

অজানা আশংকায় ঘুম আসছিল না। প্রায় আধা ঘণ্টা পর ডিউটি অফিসারটি আবার রুমে এলো। দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে দিতেই উঠে বসলাম।

সে পাশে বসে বললো, ভালো লাগছে না, গল্প করতে এলাম।

আমি বললাম, খুব ক্লান্ত, আমার ঘুম পাচ্ছে।

সে বললো, আপনাকে দেখে এতো ভালো লেগেছে, প্রেম করতে ইচ্ছা করছে। আসুন না একটু প্রেম করি।

বললাম, প্লিজ না!

সে বললো, একটু এনজয় করবো।

আমাকে ধরতে চাইলে আমি চিৎকার দেয়ার চেষ্টা করতেই আমার মুখ চেপে ধরে বলে, চিৎকার করলে অন্য পুলিশগুলো ছাড়া আর কেউ শুনবে না। তখন বাধ্য হয়ে আমাকে তাদেরকে ভাগ দিতে হবে। মুখ থেকে হাত সরিয়ে বলে, সবাই মিলে আপনাকে এনজয় করে তিনজনকে মেরে ফেললেও আমাদের কিছু হবে না। বলবো, দুজনকে মেরে, এই যুবতীকে ধর্ষণ করে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করার পর গাড়িতে ফেলে রেখেছিল। টহল পুলিশ উদ্ধার করেছে।

ভয়ে বোধহয় নীল হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হলো আজ রাতই জীবনের শেষ রাত।

আবার বললো, কিংবা যদি নাও মারি, আপনি যদি আপনার মানসম্মানের কথা না ভেবে সবাইকে বলে দেন তাহলে বলবো, গাড়িতে মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে অবৈধ কাজ করছিল। ভাই থানায় এনেছি।

আমি বললাম, সে আমার ছোট ভাইয়ের মতো।

সে বললো, তাতে কি, পুরুষাঙ্গ থাকলেই হলো।

অতএব নো চিৎকার বলে সে আমাকে জাপটে ধরে।

এরপর একে একে সব পোশাক খুলে নিয়ে মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে আমার কুমারিত্ব ছিন্ন করে। আমার পূত–পবিত্র কুমারী দেহটাকে নোংরা করে। এর মধ্যেও জীবন আশংকার চিন্তাটা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। মনে মনে বলছিলাম, বাচিয়ে রাখবে তো?

পশুটা প্রথম দফা শান্ত হলে যখন *যান প্লিজ* বলি তখন বলে, এতো মজা। আর তো পাবো না তোমাকে। তারপর শক্ত মেঝেতে আরো দুইবার আমার নরম শরীরটার ওপর আক্রমণ করে।

প্রতিবার আমার ওপরে উঠে জাপটে ধরে শরীরটা নিয়ে ছানাছানি করার সময় এমনভাবে গোঙাতো যেন দীর্ঘ দিনের ক্ষুধার্ত কুকুর যখন মরা গরু খায় তখন অন্য একটা কুকুরকে এগিয়ে আসতে দেখলে যে রকম গোঙানি দেয় অনেকটা সে রকম। কি যে কষ্টকর ছিল সে যৌনমিলন তা ভাষা দিয়ে বোঝাতে পারবো না।

এখন যখনই ওই দৃশ্যগুলো কল্পনায় আসে তখনি শরীরটাকে ডাস্টবিনের মতো নোংরা মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার ছেড়ে দিই, সাবান ঘষি সারা দেহে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে

নাটকীয়

– বি.এইচ বাবু

বইমেলায় ঘোরাফেরার ফাকে তাকে ভালোলেগে যায় আমার। মেলার বিভিন্ন স্টলে বইপত্র খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছিল সে। একই ডিপার্টমেন্টের প্রায় বিশজন বন্ধু–বান্ধবী মিলে বেরিয়েছিলাম সেদিন। দিনটি ছিল সম্ভবত ২০০১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। সবার মনোযোগ ছিল আড্ডাতেই বেশি। টিএসসি এলাকায় অনেকক্ষণ বসে থেকে চা চটপটি খেয়ে মেলা চত্বরের দিকে পা বাড়াই আমরা।

মেয়েদের অনেকেই ফুটপাথ থেকে শো পিস আর গয়নাগাটি কেনায় ব্যস্ত ছিল। কিন্তু সে সবে মন না দিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত নতুন বইপত্রের তালিকা সংবলিত পেপার কাটিংয়ে চোখ বোলাতেই ব্যস্ত ছিল স্বপ্না। স্বভাবতই সবার চোখ ফাকি দিয়ে অনেকটা একাকী পেয়ে গেলাম তাকে। সহপাঠী হলেও তখনো পর্যন্ত তার সঙ্গে আমার খুব একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তাই প্রথম সুযোগেই আলাপ জমালাম তার সঙ্গে। পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন দেখে কয়েকটি বই কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে।

আমি বললাম এসব বই ইচ্ছে করলে লেখকের অটোগ্রাফসহ কিনতে পারো তুমি।

প্রস্তাবটি ওর পছন্দ হয়। আমাকে বললো, তাহলে নিয়ে চলো সেই স্টলে।

ঘড়িতে তখন বাজে বেলা দুইটা। পরিচিত লেখকরা তখনো আসেননি মেলায়। তাই অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পরেও পছন্দনীয় লেখকের দেখা মেলেনি। শেষ পর্যন্ত অটোগ্রাফ ছাড়াই বই কিনে নিয়ে আসতে হয় তাকে।

এরপর আস্তে আস্তে ডিপার্টমেন্ট, ক্যাম্পাসে সুযোগ পেলেই কথা বললাম তার সঙ্গে। যতোই কথা বলি ততোই মুগ্ধ হই। ওর সংস্পর্শে থাকতে ভালো লাগে। বন্ধুরাও এটা নিয়ে কথা বলাবলি শুরু করে।

কলেজে অনিয়মিত ছিলাম আমি। পার্ট দুই পরীক্ষা ও সাবসিডিয়ারি পরীক্ষার ব্যস্ততায় কেটে যায় বছর খানেক। এর মধ্যে স্বপ্নার সঙ্গে বেশ ফ্র হয়ে গেছি।

২০০২ সালের বই মেলায় একদিন এক বন্ধুর সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছিলাম। সেদিন ওর প্রিয় লেখক মেলায় অটোগ্রাফ দিচ্ছিলেন। একটি বইয়ে ওর নামে অট্রোগ্রাফসহ কিনে নিলাম।

প্রায় দুই মাস কলেজ বন্ধ ছিল। খোলার কিছুদিন পর একদিন তাকে অফার করলাম। কিন্তু প্রেমে তার আগ্রহ নেই বলে এড়িয়ে গেল সে। বইটি দিতে গেলে সেটিও নিতে চাইলো না। অনেকটা অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। মানসিকভাবেও ভেঙে পড়লাম কিছুটা।

এরপর বাসায় ফেরার পথে বেশ কয়েকদিন প্রেমের অফার করলাম তাকে।

কিন্তু সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করে রহস্যময় আচরণ শুরু করলো সে। প্রথমে কয়েকদিন বললো, তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। ফাইনাল পরীক্ষার পরেই নাকি বিয়ে।

এসব কথায় আমি কান না দিলে এরপর সে আমাকে দেখলেই কেটে পড়ে, কথা বলা কমিয়ে দেয়। এ অবস্থায় কেটে যায় অনেকদিন।

অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা এসে গেছে। পড়ালেখায় মন বসে না। সিদ্ধান্ত নিলাম শেষবারের মতো তাকে অফার করবো। রাজি না হলে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আবার পড়ালেখায় মনোযোগী হবো। এসব প্রেম–ভালোসা আমাকে দিয়ে হবে না।

কলেজ থেকে ফেরার পথে আরেকদিন ধরলাম তাকে। সে আগের মতোই বললো। আমি চুপচাপ বসে থাকলাম।

নীরব থাকতে দেখে বললো, কথা বলছো না কেন?

আমি বললাম, আর কথা বলে কি হবে? সব কিছুই তো শেষ হয়ে গেছে।

এমনিতেই অর্ধেক রাস্তায় নেমে পড়ে সে। কিন্তু সেদিন নামলো না। আমার মন খারাপ দেখলে নাকি তার ভালো লাগবে না। আমার সঙ্গেই নামলো সে। ভাবলাম এবার হয়তো ভাগ্যের শিকে ছিড়েছে। না, ওর রহস্যের যেন শেষ হয় না। এখানেও সেই একই রেকর্ড বাজিয়ে চলেছে বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।

ফিরতি বাসে তুলে দিতে গিয়ে বললাম, এতোদিন ডিসটার্ব করার জন্য সরি। এরপর থেকে তোমার সঙ্গে আর কোনো কথা হবে না আমার।

স্বপ্না বললো, আমি কথা না বলে থাকতে পারবো না।

ভাবলাম কাজ হয়েছে এবার। বললাম, মিছেমিছি কষ্ট বাড়িয়ে আর লাভ কি?

বাসে তুলে দিয়ে হাটতে শুরু করলাম। কিছুদূর যাবার পর ওর ডাক শুনে ফিরলাম।

নাটকীয়ভাবে সে বললো, এতোক্ষণ যা বলেছি সব মিথ্যা।

আমি বললাম, তার মানে তুমি আমাকে ভালোবাসো?

সে বললো, ইয়েস!

এক মুহূর্তে শত রঙে ভরে গেল পৃথিবী। শত সৌরভে ভরে গেল বাতাস। বদলে গেল আমাদের জীবন।

এই প্রথমবার ভ্যালেন্টাইনস ডে যুগলে করতে যাচ্ছি আমরা। এই দিনে ভালোবাসার প্রথম উপহারটি দিতে চাই তাকে। সেটা কি হতে পারে ?

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, ঢাকা থেকে

নির্ভেজাল

– আবু সাজেদ ওয়ালীউল্লাহ

১৪ ফেব্রুয়ারি সেন্ট ভ্যালেনটাইনস ডে অর্থাৎ ভালোবাসা দিবস। অনেকে এদিনটিতে ভালোবাসা বলতে কেবলমাত্র প্রেমিক-প্রেমিকার ভালোবাসাকেই বুঝে থাকেন। এটা তাদের ভুল ধারণা। ভালোবাসা দিবসে ভালোবাসা কেবল প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এ ভালোবাসা হতে পারে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের জন্য।

মানুষ *আশরাফুল মাখলুকাত* অর্থাৎ *সৃষ্টির সেরা জীব।* কাজেই সেরা জীবের শ্রেষ্ঠ ভালোবাসা প্রদর্শন কেবল মানব-মানবী কেন্দ্রিক না হয়ে এ ভালোবাসা প্রদর্শন করতে হবে বিশ্বব্যাপী অর্থাৎ মহান আল্লাহপাক রাব্বুল আলামিনের সমস্ত সৃষ্টি জীবনের প্রতিও।

ভালোবাসার কোনো নির্দিষ্ট দিনক্ষণ নেই। ভালোবাসা সর্বসময়ের জন্য, সর্বকালের জন্য, সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।

ভালোবাসার প্রসঙ্গ এলেই মনে পড়ে আমার প্রিয় বাবার কথা। গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০২-এ তিনি পরলোক গমন করেন। বাবার স্নেহ, অকৃত্রিম ভালোবাসা ভুলতে পারবো না। আমার মমতাময়ী মা বেচে আছেন।

প্রবাসে শত কর্মব্যস্ততার মধ্যে প্রতিনিয়ত মায়ের মধুর মুখখানি ভেসে ওঠে। খুব কান্না পায় আমার। বাবা-মা যদি হ্যান্ডব্যাগে রাখার মতো কোনো সামগ্রী হতো কিংবা সে জাতীয় কোনো ব্যবস্থা থাকতো তাহলে যেখানে, যতো দূরেই যেতাম সঙ্গে নিয়ে হাটতাম, বেড়াতাম।

প্রেমিকা ও ললনার ভালোবাসায় থাকতে পারে ছলনা মেশানো, বন্ধুর ভালোবাসা হতে পারে সু-সময়ের, কিন্তু বাবা-মায়ের ভালোবাসা? উত্তর, নির্ভেজাল ভালোবাসা। বাবা-মা সর্বসময় তার সন্তানের কল্যাণ কামনা করে থাকেন।

ইংরেজি একটা গল্পের কথা মনে পড়ছে।

এক প্রেমিক তার প্রেমিকাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো। শরতের শিশির ভেজা এক সকালে প্রেমিক তার প্রেমিকাকে প্রশ্ন করলো, আচ্ছা, তুমি আমাকে কতোটুকু ভালোবাসো?

আমি তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসি। প্রেমিকা উত্তর দিল।

পাল্টা একই প্রশ্ন প্রেমিকা করায় প্রেমিক তার জবাবে বললো, প্রেমের গভীরতার প্রমাণ চাও? আরে? আমি তো তোমার জন্য আমার প্রাণটাই দিতে পারি।

প্রেমিকা বললো, ঠিক আছে, তুমি যদি এ মুহূর্তে তোমার মায়ের হৃৎপিণ্ডটি এনে আমার হাতে দিতে পারো তাহলেই বুঝে নেবো যে, তুমি আমাকে সত্যিই ভালোবাসো।

প্রেমিক তৎক্ষণাৎ তার মায়ের হৃৎপিণ্ডটি বর্শায় বিদ্ধ করলো। তারপর সেই বর্শাবিদ্ধ হৃৎপিণ্ডটি নিয়ে সিড়ি বেয়ে যখন নিচে নামছিল তখন হঠাৎ হোচট খাওয়ায় হৃৎপিণ্ডটি মাটিতে পড়ে যায়। প্রেমিক সেটি ওঠাতে গিয়ে লক্ষ্য করলো, হৃৎপিণ্ড থেকে ফিশ ফিশ কি যেন আওয়াজ বের হচ্ছে। দ্রুত কানের কাছে নিতেই সে শুনতে পেল, হৃৎপিণ্ডটি বলছে, খোকা, তোর লাগেনি তো?

আজকাল গ্রামবাংলার আনাচে-কানাচে, প্রবাসে, বিশেষ করে দক্ষিণ কোরিয়াতেও এমন অনেক পাগল প্রেমিক রিয়াজ আছে যারা নতুন শাবনূর আবিষ্কার করে তাদের পেছনে অর্জিত পয়সা উড়িয়ে দিচ্ছে। তাই এসব নয়া মজনুভাইদের উদ্দেশ্যে বলছি, আর নয়, এসব বন্ধ করুন। দেশে প্রতীক্ষারত স্ত্রীর কথা একটিবার ভাবুন, অপচয় বন্ধ করুন এবং অপরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করুন। মিছে মরীচিকার পেছনে না ছুটে স্ত্রীর প্রতি মনোযোগী হোন, ভালোবাসুন। বাবা-মায়ের খেদমতে মন দিন, সুন্দর জীবন গড়ুন। স্রষ্টা ও তার সৃষ্টিকে ভালোবাসুন। নির্ভেজাল ভালোবাসা গ্রহণ করুন।

দক্ষিণ কোরিয়া থেকে

রূপান্তর

– দিলারা পারভীন সিক্তা

নতুন মোবাইল কিনলে যা হয় আর কি! বার বার শুধু ফোন করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু বিলের কথা চিন্তা করে মিসকল আর মেসেজ-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলাম। এভাবেই পরিচয় হলো আবিদের সঙ্গে।

মিসকলের মাধ্যমে অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হয়। কিন্তু আবিদের সঙ্গে দীর্ঘসূত্রী সম্পর্কের প্রধান কারণ হলো তার অদ্ভুত কথাবার্তা। টিনএজার হিসেবে আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল প্রেম। এটা অতি সাধারণ বিষয়। তবে তার কথাবার্তা ছিল অসাধারণ। যেমন আবিদের কাছ থেকেই জানলাম যে, বিজ্ঞানীদের মতে, প্রেমিকার চোখের চকিত চাহনি, হঠাৎ স্পর্শ, এক ঝলক হাসির ফলে মানুষের মস্তিষ্ক থেকে অ্যামফিটামিন-এর মতো রাসায়নিক পদার্থ রক্তে প্রবেশ করে। এর সঙ্গে আরো কয়েকটি পদার্থ থাকে। সেগুলো হচ্ছে - ডোপামিন, নোরপাইনফৃন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, ফেনিলিথাইলামিন। শেষের এই পদার্থকে সংক্ষেপে পি বলা হয়। আর এই পি-এর বদৌলতে নাকি প্রেমিক-প্রেমিকার মুখোমুখি হলে প্রেমিক-প্রেমিকা বোকা বোকা হাসি হাসে। হাত পা ঘামতে শুরু করে। বুক কাপে ঢিপ ঢিপ করে। কিন্তু ভয়ের কথা এই যে, এই পি নাকি দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

তাই বিজ্ঞানীদের মতে, যদি প্রেম জিইয়ে রাখার জন্য কোনোরূপ ব্যবস্থা নেয়া না হয় তাহলে সর্বোচ্চ চার বছর পর্যন্ত প্রেমের মাদকতা থাকে। এর পরে এটা উধাও হয়ে যায়। যেহেতু অধিকাংশ প্রেমের বিয়ের ক্ষেত্রে প্রেম জিইয়ে রাখার কোনোরূপ ব্যবস্থা নেয়া হয় না সেহেতু শতকরা ৮০ ভাগ বিয়ের কিছুদিন পর সংসারে খিটিমিটি লেগে যায়।

আবিদভাইয়ের কাছ থেকে আরো জানলাম যে, কম বয়সের প্রেমের জন্য পি এবং অ্যামফিটামিন নামের রাসায়নিক পদার্থ কাজ করে আর বেশি বয়সের প্রেমের এনডরফিন নামের পদার্থ নিঃসৃত হয়ে প্রেমিক-প্রেমিকার ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট করে।

আবিদভাইয়ের এই সব কথাবার্তা আমার খুব ভালো লাগতো। আমি হয়তো ওনার সঙ্গে প্রেম করতে চাইতাম যদি না জানতাম তিনি কারো সঙ্গে এনগেজড। কিন্তু এই কারোটা কে সেটা না ওই মেয়ে জানতো, না অন্য কেউ। অর্থাৎ আবিদভাই কখনোই সেই মেয়েকে জানতে দেননি তার ভালোবাসার কথা। কারণ বিজ্ঞানের প্রতি তিনি খুবই আস্থাশীল এবং পি-এর নির্দিষ্ট চার বছরকে টেনে আরো লম্বা করতে চান। তাই তার ইচ্ছা বিয়ে এবং প্রেম এক সঙ্গে শুরু করবেন। যদিও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সেই মেয়েটিও তার প্রতি কিছুটা উইক।

একদিন একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। সেই মেয়েটির হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল। আমাকে ফোন করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, ওকে দোষ দিই না। কারণ ওতো আর জানতো না যে...। কতোদিন অপেক্ষা করবে কোনো সিগনাল না পেয়ে। একটু ইতস্তত করে বললেন, বিজ্ঞান যে আমাকে এভাবে ডোবাবে কে জানতো।

আমি হেসে ফেলতেই লাইন কেটে দিলেন।

আমার সঙ্গে এরপর বেশ কিছুদিন কোনো যোগাযোগ রাখলেন না। ফোন, মিসকল, মেসেজ কোনো কিছুই না। আগে প্রতিদিন ঠিক রাত ১১টায় তিনি একদিন, আমি একদিন এভাবে ফোন, মিসকল বা মেসেজের পালা চলতো। ১১টা বাজতেই যেমন অস্থির হতাম মেসেজ দিতে তেমনি পরদিন একই সময়ে অস্থির হতাম কোনো নিউজ পাওয়ার জন্য।

ওই ঘটনার পর থেকে আমার সঙ্গে আবিদভাই যোগাযোগ বন্ধ করে দিলেন। তিনি করেন কি না... এ ভাবনায় কেটে গেল বেশ কয়েকদিন। এই কয়েকদিন বেশ কষ্টে কাটলো আমার। বুঝতে পারলাম কোনো এক হরমোন ভেতরে কাজ করা শুরু করেছে।

এরই মধ্যে একদিন বান্ধবীদের সাহায্যে আবিদকে চিনে নিয়েছি। ফোনে পরিচয় হয় বলে আমাদের মধ্যে মুখ দর্শন ছিল না। আবিদ অবশ্য কিছুই টের পেল না। কারণ তখনো তিনি ওই মেয়েটির শোকে কাতর। ভাবলাম এতো দুঃখ বিলাস কিছুদিন পর ঠিক হয়ে যাবে।

কাটলো কিছুদিন। তারপর এলো সেই কাঙ্ক্ষিত ফোন। মোবাইলটি হাতে নিতেই আমার সারা শরীরে এক অদ্ভুত শিহরণ বয়ে গেল। OK বাটন চেপে ধরতেই ওপাশ থেকে ভেসে এলো অতি সাধারণ প্রশ্ন, কেমন আছো?

কিন্তু আমার কাছে মনে হলো অসাধারণ। আমি তো সব সময় ভালোই থাকি। তবে আপনার খবর কি? চার বছর সুখে থাকতে চেয়ে এখন দেখছি বিয়েই করতে পারবেন না। আধুনিক *দেবদাস* হয়ে যাচ্ছেন নাকি! আমি একটু ঠাট্টার ছলেই কথাগুলো বলেছিলাম।

আবিদ শান্ত, স্থির হয়ে জবাব দিল, কথাটা মন্দ বলোনি। আমার হয়তো আর কোনোদিনই বিয়ে করা হবে না।

ওমা! কেন?

অন্য মেয়েকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি? আমার ভালোবাসা শেষ হয়ে গিয়েছে।

কি যে বলেন, ভালোবাসা শেষ হয় নাকি?

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই তিনি অনুরোধের সুরে বললেন, প্লিজ, আমাকে অসৎ হতে বলো না। নিজের কাছে আমি সৎ থাকতে চাই।

এরপর আর কোনো কথা বলতে পারিনি। লাইন কেটে দিলাম। মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে আমি কি আবিদকে অসৎ হতে বলেছি? আমি কি অসৎ বানানোর চেষ্টা করেছি? আমার মনে ভয়, সংশয়। রাগ হলো নিজের ওপর। ঠিক করলাম ওনাকে আর বেশি ঘাটাবো না।

এরপর থেকে কথা হলো এলোমেলো, অগোছালো। আবিদের এক কথা, মানুষ ভালোবাসে একবারই। কিন্তু আমি ব্যাপারটা মানতে পারি না। অনেক আশা নিয়ে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় ফোনে। আপনার সঙ্গে আমার বয়স, ক্লাস, এমনকি চিন্তাধারাতেও অনেক ব্যবধান। তাহলে আপনি কেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। দয়া করে আবার ভাববেন না যে, আমি এটা চাইছি না, কৌতূহল হলো তাই জিজ্ঞাসা করলাম।

একটু হাসলেন বোধহয়। আমি ফোনে এর হালকা স্পর্শ পেলাম। বললেন, এর কারণ তুমি ভালো শ্রোতা। আমি এক অস্থির সময়ের মধ্যে যাচ্ছি। মাথার মধ্যে অনেক কথা ঘোরাঘুরি করে। বিশ্বস্ত কাউকে বলতে ইচ্ছা করে। তুমি সেই রকম একজন বন্ধু। তাই...।

এই কথা শুনে আমার হয়তো খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু খুশি হতে পারলাম না। কিন্তু চেষ্টা করলাম আরো ভালো শ্রোতা হতে। আবিদের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। বুঝতে পারতাম বিরহটাকে যতোটা সামান্য মনে করেছিলাম ঘটনা ততো সামান্য নয়, বরং বেশ জটিল। এবং আস্তে আস্তে আরো জটিল হচ্ছে।

আবিদ লেখাপড়া একদমই ছেড়ে দিয়েছে। মেয়েটিকে হিংসা করতে ইচ্ছে হয়। আমি বুঝলাম ভালোবাসা হচ্ছে পানির মতো। অতিরিক্ত পানির জোয়ার বা পানির অভাবে গাছ যেমন মারা যায় তেমনি ভালোবাসা না পেলে কিংবা না দিতে পারলেও হৃদয় শুকনো হয়ে যায় যা মানুষকে জীবন্মৃত করে ফেলে। আবিদ সে পথেই যাচ্ছে। একজন বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে তাকে সাহায্য করবো, তাই ঠিক করলাম দেখা করবো তার সঙ্গে।

পরদিনই সোজা গিয়ে পৌছালাম ইউনিভার্সিটির ওনার ডিপার্টমেন্টে। বেশি খুজতে হলো না। দেখলাম একটা গাছের নিচে উদাসভাবে বসে আছেন। সামনে গিয়ে দাড়ালাম।

আমার দিকে মুখ তুলে চাইলেন।

আমি জেবিন।

মৃদু হাসলেন। মোবাইল ফ্রেন্ড। কিন্তু আশ্চর্য, আমি তো তোমাকে চিনি। চেনারই কথা। আমরা একই কলেজে পড়েছি।

আমি আপনার এক বছরের জুনিয়র।

তুমি জানতে যে আমি...।

হ্যা জানতাম।

কিভাবে?

ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। বলে তার পাশে ঘাসের ওপর বসে পড়লাম।

কিছু বলবে নাকি?

হ্যা।

ফোনেও তো বলতে পারতে।

না, আমি সামনাসামনি বলতে চাই।

ঠিক আছে বলো।

একটু দম নিলাম। তারপর বললাম, আমি আপনার একটা উপকার করতে চাই।

জোর করে উপকার করবে?

হ্যা, তা বলতে পারেন।

হেসে ফেললেন তিনি। ঠিক আছে, উপকার করো। কিন্তু এতো কঠিন হয়ে আছো কেন? ইজি হও।

না, এতে আমি সব কথা ভুলে যেতে পারি। আজকে আমাকে কথাগুলো বলতেই হবে।

আবিদ অবাক হয়ে কিছুক্ষণ গভীরভাবে দেখলেন আমাকে। তারপর বললেন, আচ্ছা শুরু করো।

আপনি বলেছিলেন, ভালোবাসা শেষ হয়ে যায়। আসলে কথাটা ঠিক নয়।

থামো। জোরে ধমক দিলেন আমাকে। তুমি আমাকে উপদেশ দিচ্ছো? কি চাও তুমি?

ধমক খেয়ে কিছুটা ভড়কে গেলাম। তারপরও জোর গলায় বললাম, আমি চাই আপনার ভুলটা ভাঙুক।

কিসের ভুল? আমি যে একজনকে ভালোবাসতাম সেটা কি ভুল ছিল?

আমি তো সেটা বলিনি।

শোনো মেয়ে, সেটা যদি ভুল না হয় তাহলে এর চেয়ে বড় সত্যি আমি আর কাউকে ভালোবাসাতে পারবো না। এবং যদি অন্য কাউকে ভালোবাসি তাহলে প্রমাণ হবে যে, প্রথমটা ভুল ছিল। আমি সেটা কখনোই চাই না। প্রেম তো একবারই আসে, তাই না?

মৃদু হাসলাম আমি। আবিদভাই, বিজ্ঞান সম্পর্কে আপনি এতো জানেন আর সামান্য একটা সূত্র জানেন না।

সূত্র? কিসের সূত্র?

ভালোবাসা তো একটা শক্তি, তাই না?

অবশ্যই। আর সে শক্তিতেই তো আমি...।

আমি জানি আপনি কি বলবেন। আবিদভাই, আমি একজন কমার্সের স্টুডেন্ট হয়েও জানি যে নিউটন নামের একজন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছেন যে, *শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নেই। এটি কেবল এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হতে পারে।* আমি কি ভুল বললাম।

কিছুই বললেন না তিনি। শুধু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তাছাড়া আপনার কাছেই তো শুনেছি যে, চার বছর পর নাকি পি তেমন কার্যকর থাকে না। চার বছর তেমন বেশি সময় না। চেষ্টা করেন। জীবনটাকে এভাবে শেষ করে দেবেন না। ভালোবাসার রূপান্তর ঘটান। আশপাশে চেয়ে দেখেন, প্রতিনিয়ত ভালোবাসার রূপান্তরই ঘটছে চার পাশে। আমি হয়তো আরো কিছু বলতাম। কিন্তু ওনার বিস্মিত চোখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো, আর কোনো কিছু বলার প্রয়োজন নেই। হয়তো হৃদয়ে জোয়ার আসতে শুরু করেছে।

কোনো কিছু না বলে উঠে চলে এলাম সামনে থেকে। একটু দুরে গিয়ে পেছন ফিরে তাকালাম। তখনও তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই আমি আবিষ্কার করলাম, প্রাপ্তি নয়, ভালোবাসার অন্য এক সার্থকতা।

গাজীপুর থেকে

শীত বিকেল

– আনোয়ার মোল্লাহ

প্রতিদিনের মতো সেদিনও আমি প্রচণ্ড শীতের মধ্যে মাথায় মাফলারটা ভালোভাবে বেধে সকালে প্রাইভেট পড়তে যাচ্ছি সাইকেল নিয়ে। প্রচণ্ড কুয়াশা পড়েছে চারদিকে, কিছু দেখা যায় না। তখন চলছিল শৈত্যপ্রবাহ। কুয়াশা এবং শীতে গ্রামের পথ প্রায়ই শূন্য থাকে। তার উপর শৈত্যপ্রবাহ। মাঝে মধ্যেই উত্তরের হিমেল বাতাস বইছে। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কেউ সাধারণত বাড়ি থেকে বের হয় না। আমি বাড়ি থেকে এক দেড় কিলোমিটার যাওয়ার পর একটু সামনে দেখি একটি ছায়ার মতো দেখা যায়। কুয়াশায় ভালোভাবে দেখা যায় না। ভাবলাম এতো সকালে কুয়াশা আর শীতে আবার কে যায়। কাছে গিয়ে দেখি আমারই তো বোন স্বাতী। বোন মানে চাচাতো, ফুপাতো, মামাতো, খালাতো এবং জেঠাতো।

আমি সাইকেল থামিয়ে স্বাতীকে বললাম, কি স্বাতী, এতো সকালে এই কুয়াশা আর শীতে তুমি কোথায় যাচ্ছো?

কেন? বই খাতা দেখেও বুঝতে পারো না কোথায় যাচ্ছি? ঢং। যাও তুমি যেখানে যাচ্ছো সেখানে যাও। স্বাতীর জবাব।

আমি আর কোনো কথা না বলে সাইকেলের পেডালে চাপ দিতে যেই উদ্যত হলাম তখনই স্বাতী সাইকেলের ক্যারিয়ারে ধরে ফেললো এবং বললো, বড় যে রাগ দেখিয়ে চলে যাচ্ছো।

বললাম, রাগ দেখালেও তুমি আর কি বলছো। সত্যিই সেলুকাস! হায়রে নারী জাতি তোমরা সব কিছুই পারো। তোমাদের জন্য...।

বলো, বলো আমাদের জন্য কি বলো। স্বাতীর আক্রমণাত্মক কথা আমাকে।

স্বাতী, তুমি তো এ বছর এসএসসি পরীক্ষা দেবে, তা কি রকম প্রস্তুতি নিয়েছো। বললাম আমি।

এই মোটামুটি। নয়টায় স্যারের কাছে কোচিংয়ে গণিত এবং ইংরেজি পড়ছি। অন্যান্য বিষয়গুলো বাড়িতেই পড়ছি, বললো স্বাতী।

স্বাতীকে বললাম, এভাবে এই কুয়াশার মধ্যে একা স্কুলে যাচ্ছো, তোমার ভয় করে না?

আজকে অবশ্য একটু একটু ভয় করছিল। কারণ চারদিকে কিছু দেখা যায় না। এখন যখন তোমাকে পেয়ে গেলাম তখন আর ভয় কিসের। তুমি আছো না?

প্রথমে যে এতো দেমাগ দেখালে, ভাবছিলাম তোমাকে জিজ্ঞাসা করে গুরুতর অন্যায় করে ফেলেছিলাম।

আর তুমি দেখা যায় এখনো রেগেই আছো। বললো স্বাতী।

রাগবো না? তুমি এমন একটা ভাব করলে। আর আমি রাগবো না?

স্বাতী বললো, থাক, আমার ভুল হয়েছে। মাফ চাইছি। এবার হলো তো। তা শাকিবভাই তুমি নাকি অনার্স ভর্তি বাদ দিয়ে পাস কোর্স বিএসসি ভর্তি হয়েছো।

বললাম, হয়েছি, কেন কি হয়েছে।

না এমনিতেই ধারণা করেছিলাম তুমি ভালো ছাত্র হিসেবে কোনো ভালো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবে। বললো স্বাতী।

বললাম, সবার কপালে কি সব কিছু হয়। ধরো আমার কপালে ইউনিভার্সিটিতে পড়া নেই। তাই হলো না।

কথা বলতে বলতে স্বাতী তার স্কুলের কাছাকাছি এসে গেল। বললাম, চলি স্বাতী।

এই বলে আমি সাইকেলে চড়ে বসলাম। পেছনে স্বাতী ডেকে বললো এই, এই শাকিবভাই, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

বললাম, পরে হবে, এখন যাই সময় নেই।

এর কয়েকদিন পর এক বিকেলবেলা বাড়িতে আমাকে প্রহরী রেখে আমার মা-কাকিরা পাশের বাড়িতে বেড়াতে গেছেন। এই সুযোগে আমার রুমে বসে কিছু রোমান্টিক কবিতা আবৃত্তি করছি। বাড়িতে মা-কাকিরা থাকলে রোমান্টিক কবিতা আবৃত্তি করতে আমার শরম লাগে। তাই এ সময়ে

একটু আয়েশ করে গলাটা খুলে কবিতা আবৃত্তি করছি। হঠাৎ দরজার শব্দে পেছনে তাকালাম দেখি স্বাতী বই খাতা নিয়ে দাড়িয়ে।

বললাম, কি ব্যাপার! এই অসময়ে বই খাতা নিয়ে একেবারে অন্দর মহলে, ঘটনা কি?

স্বাতী বললো, আমি আসছি অনেকক্ষণ ধরে। বারান্দায় দাড়িয়ে তোমার কবিতা শুনছিলাম।

বললাম, এটা খুব অন্যায়, তুমি চুপিচুপি আমার কবিতা শুনে খুব খারাপ করেছো। আচ্ছা বসো, তারপর বলো, তুমি কি জন্য এসেছো।

এসেছিলাম কয়েকটা অংক বুঝতে। কিন্তু তোমার কবিতা শুনবো এবং ওই কবিতাই আমাকে বোঝাতে হবে, স্বাতী বললো।

স্বাতীর কথা শুনে আমিও রীতিমতো হতবাক! কি বলে মেয়ে! বললাম, স্বাতী, তুমি অংক করলে করতে পারো, না হলে চলে যাও। কারণ এ সময়ে বাড়িতে কেউ নেই। যদি কেউ এসে দেখে, আমি তোমাকে রোমান্টিক কবিতা বোঝাচ্ছি তাহলে আমার খবর আছে। সুতরাং তুমি চলে যাও। তোমাকে রোমান্টিক কবিতা বোঝানোর মতো সম্পর্ক তো আমার নেই, ছিল না বা সম্ভব না।

কিন্তু কেন, কি কারণে সম্ভব হবে না, আমি কি কারো চেয়ে খারাপ নাকি, নাকি কোনো কিছু আমার কম আছে? কি অন্যায় আমি করেছি সেটা তোমাকে বলতে হবে। কথাগুলো বলে স্বাতী হাউ মাউ করে কেদে একেবারে আমার বুকের ওপর গড়িয়ে পড়লো।

এতোদিন আমি আমার বুকে যা সঞ্চিত করে রেখেছিলাম আমার আর স্বাতীর বুকের উত্তাপে মুহূর্তেই তার সবটুকু মোমের মতো গলে যেতে লাগলো।

আমি শুধু এটুকুই বলতে পারলাম, স্বাতী, তুমি এতোদিন কোথায় ছিলে?

মহেশপুর, জয়পুর, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ থেকে

ঐশ্বর্যের কাছে

– ফারহানা তেহসীন

আতিকের সঙ্গে পরিচয় ১৯৯০ সালে। ধীরে ধীরে পরিচয় গাঢ় থেকে গাঢ়তর এবং অবশেষে বিয়ে। আতিক বিদেশি জাহাজে চাকরি করে। বিয়ের পর তার অন্যান্য বন্ধুরা যেখানে তিন থেকে চার মাস পর জাহাজে জয়েন করছে সেখানে সে বিয়ের নয় মাসের মাথায় জাহাজে ওঠে।

বিয়ের সময় সে ছিল থার্ড অফিসার। অনেক জাহাজে স্ত্রী নেয়ার অনুমতি দিতো না বলে সে সেই সব জাহাজ বাতিল করে দিতো। এক সময় ব্যাংক বালান্স যখন মাত্র পঞ্চাশ ডলারে এসে ঠেকলো তখন নিরুপায় হয়ে বারবার কম্পানির কার ক্যারিয়ারে সে জয়েন করে। এই কম্পানিতে তখন সে নতুন। কম্পানির পারমিশন না পেলে বা জাহাজে আগে থেকেই অন্যদের স্ত্রী থাকলে আমার যাওয়া হবে না। এছাড়া রয়েছে ইউএস ভিসার ঝামেলা। না পাবার আশংকা বেশি। এসব সমস্যা হলে সাত মাস আতিক থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে। ভাবতেই বুকের ভেতর এক সমুদ্র কষ্ট। অবশেষে বিয়ের নয় মাসের মাথায় সে চলে গেল আমাকে বিশাল শূন্যতায় ভাসিয়ে।

এক একটি দিন, এক একটি রাত যেন এক যুগের সমান। কি কষ্ট! মনে হতো পৃথিবীর সব কিছুর বিনিময়ে শুধু এই মানুষটিকে আরেকবার চোখের সামনে দেখতে চাই। তিন মাস পর সুখবর আসে। সে কম্পানির পারমিশন পেয়ে যায়। এখন ইউএস এম্বাসি-তে ভয়াবহ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। নির্ধারিত দিনে এম্বাসি- তে ভিসার জন্য আমার অপেক্ষা যেন আকাশে তারা গোনার মতো। এক সময় উইন্ডো, নাম্বার-৫-এর সাক্ষাতের জন্য ডাক পড়ে। আমেরিকান লোকটা কাগজপত্র পরীক্ষা করলো। কেন যাচ্ছি, কতোদিন থাকবো ইত্যাদি প্রশ্ন। কাবিনামা পরখ করলো। তারপর অবিশ্বাস্যভাবে এক বছরের জন্য ভিসা দিয়ে দিল। যেন স্বপ্ন। সত্যিই কি আমি জাহাজে যেতে পারবো, আতিকের কাছে যেতে পারবো! লোকটাকে বললাম, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তুমি আমাকে আমার হাজব্যান্ডের কাছে যাবার সুযোগ দিয়েছো।

সে হেসে ফেললো।

ফোনে আতিক বিশ্বাস করছিল না। বার বার এক প্রশ্ন, সত্যি পেয়েছো? সত্যি? উল্লেখ্য, জাহাজে কম্পানি বা ক্যাপটেনের সম্মতি পাওয়া সত্ত্বেও একমাত্র ভিসা সমস্যার কারণে ম্যারিনারের ওয়াইফরা জাহাজে যাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়।

তারপর আর কি। নির্দিষ্ট দিনে উড়াল দিলাম। আমার জয়েনিং পোর্ট ছিল জাপানের নাগোয়া সিটিতে। এয়ারপোর্ট থেকে নৌবন্দরের দূরত্ব যেন ফুরোতেই চায় না। কি অসীম উত্তেজনা বুকের ভেতর। তিন মাস পর আবার সেই প্রিয় মুখটি দেখার জন্য কি অস্থিরতা, উদ্বেগ আর ভালোলাগায় ভরে আছে মন। পোর্টে পৌছে দেখলাম জেটিতে দাড়িয়ে আছে এমভি ইজিন। এতো বড় জাহাজ। জাহাজটি ছিল চোদ্দ তলার যার তেরো তলাতে অফিসারদের কেবিন।

জাহাজের সিটিং বা টিভি রুমকে স্মোকিং রুম বলা হয়। সেখানে অপেক্ষা করতে করতে দেখলাম অসম্ভব প্রিয় মানুষটিকে নীল বয়লার সুট পরনে। তারপর ক্যাবিনে গেলাম। দুজনে দুজনার দিকে অপলকে তাকিয়ে আছি। এতো তাড়াতাড়ি দেখা হবে স্বপ্নেও ভাবিনি। আনন্দে দুজনার চোখেই পানি এসে যাচ্ছে। সেদিন জানলাম হিরক নয়, স্বর্ণ নয়, রৌপ্য নয়, প্রাসাদ নয়, ক্ষমতা নয়, একটি মানুষের বুকের কাছে ভালোবাসায় মোড়ানো থাকে পৃথিবীর সব সুখ, ঐশ্বর্য। কি বিস্ময়! কি অপার বিস্ময়!

চট্টগ্রাম থেকে

লুসিয়া

– আবু সা'দাত মেসবাহ

রাতাশাক-এর সঙ্গে পরিচয় ব্যবসায়িক সূত্রে। থাইল্যান্ডের ওই কম্পানির সঙ্গে ব্যবসা শুরু করার পর থেকে অনেক থাইদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। তবে রাতাশাকের বিষয়টি ভিন্ন। চাকরি সূত্রে সে বাংলাদেশে এসেছে। বাংলাদেশেই তার প্রথম পোস্টিং। সুদর্শন, স্মার্ট আর ভীষণ আমুদে। তার সঙ্গে খুব অল্প সময়ের পরিচয়ে খুব সহজে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। বিশেষ যে কারণে সম্পর্ক বেশি হলো তার

একটি কারণ হচ্ছে রাতাশাকের বাবা পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে চাকরি করেন এবং আমার বাবাও পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতেন।

একদিন রাতাশাক তার ব্যক্তিগত অ্যালবাম দেখালো, তার ফ্যামিলি ফটো দেখালো দুই ভাইবোন। বোনটি ছোট, মা স্কুল শিক্ষিকা। ছোট ফ্যামিলি তাদের। আমাকে তার প্রিয়ার ছবি দেখালো। অপূর্ব সুন্দর থাইদের চোখ এবং নাকের যে বৈশিষ্ট আমাদের দেশের রমণীদের মতো টানাটান না হলেও চেহারার মধ্যে অন্য একটা আকর্ষণ আছে নাম অংথুন। রাতাশাকের বোনের চেহারা আরো সুন্দর। তার চোখের কোণে কোনো ভাজ নেই। তবে নাকটাতে থাই ভাব ফুটে উঠেছে। তার নাম লুসিয়া। থাই নারীরা যে খুব ফাস্ট তা ছবিতে বোঝা গেল।

এভাবে রাতাশাকের সঙ্গে সম্পর্ক বেশ গাঢ় হয়ে উঠলো। কিন্তু ব্যবসায়িক ব্যস্ততার কারণে তার সঙ্গে দেখা করা হয়ে ওঠে না। কাজের প্রয়োজন কম্পানিতে গেলে সাক্ষাৎ হয়। অফিসে শত ব্যস্ততার মাঝেও নিজ হাতে আমাকে কফি বানিয়ে খাওয়াতো। তার সঙ্গে চুক্তি হলো, সে আমাকে থাই ভাষা শেখাবে আর আমি তাকে বাংলা ভাষা শেখাবো। কাজের প্রয়োজনে কম্পানি অফিসে গেলে তার কাছ থেকে থাই ভাষার তালিম চলতো। সে অবশ্য বাঙালি স্টাফদের কাছ থেকে কিছু কিছু বাংলা শিখতো। আমি অফিসে ঢুকলে আমাকে বাংলায় অর্ভ্যথনা জানাতো।

রাতাশাকের সঙ্গে ঢাকার বিভিন্ন লোকেশনে গ্রুপ ছবি তুলেছি। সেগুলো দেশে নিয়ে তার ফ্যামিলিতে এবং বন্ধু মহলে দেখিয়ে আমার সম্পর্কে আলোচনা করেছে তার খুব প্রিয় বন্ধু হিসেবে। একদিন তার রুমে বসে গল্প করছি এমন সময় তার প্রেমিকা মোবাইলে রিং করলে কথা বলার এক পর্যায়ে আমাকে মোবাইল দিল। আমি ইংরেজি ও থাই ভাষা মিলিয়ে কথা বলছি। পাশ থেকে রাতাশাক আমাকে শিখিয়ে দিল, আমি একটা বাক্য উচ্চারণ করলাম।

ফোম লাক খুন, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

সে একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো, ফোম লাক খুন। কথার শেষ পর্যায়ে আমাকে তার মোবাইল নাম্বার দিয়ে বললো তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে।

যে বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলাম তার অর্থ জানতাম না। তবে বুঝতে পারলাম কিছু একটা হলো। পরে রাতাশাক আমাকে এর অর্থ বললে বুঝতে পারলাম। অংথুন-কে মোবাইল করলাম এবং বিষয়টি বুঝিয়ে বললাম। রাতাশাক আমার সঙ্গে জোক করেছে বিষয়টি সে বুঝতে পারলো। তারপরও সে আমাকে সারপ্রাইজের জন্য রেডি থাকতে বললো এবং কয়েকদিন পর অংথুন মোবাইল করলো, রাতাশাকের বোন লুসিয়ার সঙ্গে আমার কথা বলতে বললো।

লুসিয়া আমার সম্পর্কে মোটামুটি জানতো এবং আমার ছবি দেখেছে বলে জানালো। এক পর্যায়ে অংথুন-এর শেখানো মতো লুসিয়া বললো, আমি তোমাকে ভালোবাসি। লুসিয়া-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি যা বলছো তার অর্থ কি তুমি জানো?

তাকে ইংরেজি ও থাই মিলিয়ে বুঝিয়ে দেয়াতে সে লজ্জা পেল। তবে আমাকে তার পোস্টাল অ্যাড্রেস জানিয়ে দিল।

আমিও আগ্রহ নিয়ে আমার পোস্টাল অ্যাড্রেস জানিয়ে আলাপ শেষ করলাম। কয়েকদিন অতিবাহিত হতে না হতেই লুসিয়া-র পাঠানো একখানা চিঠি ও কিছু গৃটিংস কার্ড পেলাম। আমার শত ব্যস্ততার মাঝেও একটা রিপলাই পাঠালাম।

মাস দুই পর গত মে মাসে প্রথম দিকে হঠাৎ একদিন রাতাশাক মোবাইল করলো, বন্ধু, আমার ট্রান্সফার হয়ে গেছে।

কোথায়?

থাইল্যান্ড। আগামী সপ্তাহে চলে যাবো। তুমি অবশ্যই একটু দেখা করবে।

আপ্রাণ চেষ্টা করবো দেখা করতে। কিন্তু কাজের চাপ সে সপ্তাহে এতো বেড়ে গেল যে ঢাকায় যাওয়া সম্ভব হলো না। ক্ষমা চেয়ে চিরকুট দিলাম আর কিছু গিফট পাঠালাম অংথুন ও লুসিয়ার জন্য। দেশে গিয়ে রাতাশাক গিফট পৌঁছে দেয়ার পর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চিঠি দিল অংথুন ও লুসিয়া।

এরপর এখন প্রতি মাসে অন্তত দুই তিনটা চিঠি দেয়া-নেয়া হয় আমাদের মধ্যে। লুসিয়ার লেখা চিঠিতে যে আবেগ থাকে তা পড়ার পর আমার শত ব্যস্ততার মাঝেও তার জন্য সময় বের করে নিতে হয়। রাতাশাক ভালো বন্ধু হলেও যোগাযোগ বেশ কমে গিয়েছিল। কিন্তু লুসিয়া তা রক্ষা করে চলেছে ভালোভাবেই। আগামী জুন মাসে রাতাশাক অংথুনের বিয়ে অনুষ্ঠানের দিন ধার্য হচ্ছে। তাদের বিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য অগ্রিম চিঠি দিয়েছে এবং আমার স্পন্সরের কথা বলেছে।

আমারও খুব ইচ্ছা তাদের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার। কারণ লুসিয়াকে দেখার জন্য হলেও আমাকে যেতে হবে। কেননা তাকে দেখার সাধ অনেক দিনের। তার পাঠানো ছবিগুলো আমাকে ভীষণ আকৃষ্ট করেছে।

খুলনা থেকে

স্বর্গ

– বি.জি. মণ্ডলা

ভালোবাসা সৃষ্টির আদিম উপাদান। তাই সৃষ্ট জগতের সর্বত্র ভালোবাসার আবেশ বিদ্যমান। ভালোবাসার শূন্যতায় সৃষ্টি ধ্বংস অনিবার্য। কারণ ভালোবাসার বিপরীত শব্দ ঘৃণা। তাই ভালোবাসার পতন হলে ঘৃণা এসে ভর করে। ঠিক যেমন দিনের শেষে রাত।

ভালোবাসা কোনো বস্তু নয়, ভালোবাসার কোনো ভাষা নেই। এটা স্বর্গীয় আবেশ মাত্র যা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। পৃথিবীর সব দেশের সব ভাষাভাষী মানুষের ভালোবাসার অভিব্যক্তি অভিন্ন। শুধু মানুষ নয়, ইতর জীবের মধ্যেও ভালোবাসার দ্যোতনা লক্ষ্য করা যায়। ভালোবাসার দুটি ধারা। স্বকাম ও নিষ্কাম। রোমান্টিক বা স্বকাম প্রেম সকল জীবের মধ্যে বিরাজমান। কিন্তু প্লেটোনিক বা নিষ্কাম প্রেম নিয়ে অনেকে দ্বিমত পোষণ করেন।

মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড-এর মতে, কাম থেকে ভালোবাসার উৎপত্তি। সুতরাং ভালোবাসার মূলে কামনা থাকবেই। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন, যুবক-যুবতীর প্রেম সন্তানের প্রতি মাতা পিতার স্নেহ, স্বামী-

স্ত্রীর ভালোবাসা এসবই কামনা থেকে উৎসারিত। এমনকি অদৃশ্য সৃষ্টিকর্তার প্রতি যে ভালোবাসা তার পেছনেও আছে পরকালে স্বর্গ প্রাপ্তি। অতএব নিষ্কাম প্রেম বলে কিছু নেই।

কিন্তু এর বিপরীত ভাবধারাও লক্ষ্য করা যায়। মূকবধির, পঙ্গু সন্তানের প্রতিও মাতা-পিতার স্নেহ কম থাকে না। পোষা পশু-পাখির প্রতি মায়া-মমতা যথেষ্ট। পোষা বিড়ালটা হারিয়ে যাওয়ায় কাদতেও দেখা যায়। ইতর জীবের মধ্যেও সন্তান বাৎসল্য ও প্রভু ভক্তির নজির নিষ্কাম প্রেমেরই প্রতীক। বিশ্ব প্রকৃতি হলো ভালোবাসার আধার। প্রকৃতির ভালোবাসায় অবগাহন করে জীবকুল মেতে ওঠে মধুর উল্লাসে। বসন্ত ঋতু হলো প্রকৃতির ভালোবাসার ঋতু। তাই বসন্তের আগমনে প্রকৃতির মন মাতানো সাজে জীবকুল হয়ে পড়ে দিশেহারা। গাছে গাছে নতুন পাতায় বাহার চারদিকে রঙ বেরঙ-এর ফুলের হাতছানি। মৃদু-মন্দ দখিনা বাতাস, কোকিলের কুহু কুহু রব এসবের উদাস করা প্রেমের পরশ বুলিয়ে যায় সকলের হৃদয় তন্ত্রিতে। তাই বিরহী বধূ মনের অজান্তে কোকিলের সঙ্গে গেয়ে ওঠে, *শীত গেল বসন্ত এলো, ওই না এলো ফাল্গুন মাস...*।

মানুষ সুন্দরের উপাসক। যা কিছু সুন্দর তা মানুষ ভালোবাসে। তাই সে ভালো খাদ্য, ভালো পোশাক, ভালো সঙ্গীত, গাড়ি-বাড়ি সব কিছু হতে পারে। কিন্তু নরনারীর হৃদয় হলো ভালোবাসার পীঠস্থান। এ জন্য প্রেমের সমাধি প্রতিষ্ঠা করে অনেকে অমর হয়ে আছেন। তাজমহল তারই উদাহরণ। আবার বিরহী প্রেমের উপাখ্যান সৃষ্টি করে জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে যেমন লাইলি-মজনুর প্রেম, ইউসুফ-জোলেখার কাহিনী, বৈষ্ণব সাহিত্যের চণ্ডিদাস ও রজকিনীর উপাখ্যান। চণ্ডিদাস ভালোবাসতো রজকিনীকে। কিন্তু দুজনের কথা হয়নি কখনো। রজকিনীকে এক নজর দেখার জন্য চণ্ডিদাস ছিপ ফেলে বসে থাকতো জলের ঘাটে কখন জল নিতে আসবে রজকিনী। এভাবে চললো একটানা বারো বছর। হয়তো রজকিনীর হৃদয়েও দোলা দিয়েছিল প্রেমের পরশ। শেষে একদিন চণ্ডিদাসকে রজকিনী জিজ্ঞাসা করলো,কি গো, মাছ হলো?

চণ্ডিদাস উত্তর, এই মাত্র ঠোক দিল। অর্থাৎ মাছ ধরা ছিল চণ্ডিদাসের উপলক্ষ।

পারস্যের অমর প্রেমের কাহিনী লাইলী-মজনুর উপাখ্যান লেখা শেষ হলে হাজার হাজার চিঠি আসতে লাগলো লেখক, কবি জামিরের কাছে। সে যুগের যুবক-যুবতীরা লিখে জানালো, আপনার এ বুক ভাঙা বিরহী প্রেম আমরা সইতে পারছি না।

তখন কবি জামির পুনরায় উপসংহার লিখলেন। তাতে তিনি লিখলেন যারা জীবনে দাড়িতে ক্ষুর লাগাবে না তারাই হবে পরকালে লাইলী-মজনুর বিয়ের বরযাত্রী।

সে যুগে বহু যুবক তা পালন করেছিল।

কলারোয়া, সাতক্ষীরা থেকে

বাথরুম কানেকশন

– অয়ন

আমাদের নতুন ভাড়াটিয়া আসে ডিসেম্বর মাসে। আন্টির মাধ্যমে জানতে পারলাম ওনার মেয়ের নাম নূপুর। নূপুরের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা আমাদের সিড়িতে। আমি ছাদ থেকে নিচে নামছি আর নূপুর ছাদে আসছিল। সে আমাকে ক্রস করে উঠে আসছিল। তখন আমি বললাম, এই যে শোনো।
হঠাৎ দাড়িয়ে মুখের সামনে পড়া চুল হাতের আঙুল দিয়ে সরিয়ে বললো, আমাকে বলছেন?
বললাম, তুমি নিশ্চয় নূপুর।
মাথা তুলে বললো, হ্যা।
আমি অয়ন।
ব্যস। এভাবে আমাদের প্রাথমিক পরিচয় পর্ব শেষ হয়।
এরপর মাঝে মধ্যেই আমার ও নূপুরের মধ্যে গল্পগুজব হতো। এতে আমি এক পর্যায় নূপুরের প্রতি এতো দুর্বল হই যে, কলেজ, প্রাইভেট এবং অন্যান্য সময় তাকে দেখার জন্য রাস্তাতে দাড়িয়ে থাকতাম। বিকেলের আগে তেমন ছাদে উঠতাম না। কিন্তু এখন রোজ ছাদে উঠি। এভাবে আমি সর্বদা সবখানে নূপুরকে অনুভব করতে থাকি।
একদিন তাদের বাসায় অনেক আত্মীয়স্বজন আসে। ফলে বাথরুম নিয়ে কিছুটা সমস্যাতে পড়তে হলো তাদের। তাই বাধ্য হয়ে নূপুর একদিন আমাদের বাথরুমে এসে গোসল করতে থাকে। আমি না জেনে খুব তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকতেই তার শরীরের দিকে নজর পড়ে যায়।
তখন যেন আমরা দুজনই ক্ষণিকের জন্য বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। তবুও আমার চোখকে তার ব্রা আবদ্ধ হিমালয় থেকে সরিয়ে *সরি* বলে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসি। সেদিন বিকেলে নূপুর আমাকে ছাদে দেখেই কাছে আসে।
তখন তার কাছে আমার ভুল আবার স্বীকার করলাম।
নূপুর বললো, ঠিক আছে। আসলে ভুল তো আমারই। আমিই ভুল করে বাথুরুমের ছিটকানি আটকাইনি। সেসব কথা থাক। এখন তুমি তোমার নিজের কথা বলো।
বললাম, নিজের কথা মানে?
তুমি কাউকে পছন্দ কর কি না।
বললাম, এখনো করিনি। তবে তোমার মতো মেয়ে পেলে করতে আপত্তি থাকবে না।
নূপুর বললো, আমাকে ভালোবাসতে তোমার কোনো আপত্তি আছে নাকি?
বললাম, কি বললে? আবার বলো আমি কেমন জানি অন্য কিছু শুনতে পেয়েছি।
আমার এ কথা শুনে আমার হাতে একটা ছোট চিরকুট ধরিয়ে দিয়ে সে বাসায় দৌড় দিল। সেই চিরকুটে লেখা ছিল –
যেদিন তোমাদের বাসায় আমি আসি সেদিনই তোমাকে আমি দেখি। সেই রাতে আমি তোমাকে নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখি। আমরা যেন নীল আকাশে নিচে খোলা মাঠে হাতে হাত রেখে অন্তরঙ্গ মুহূর্ত অতিবাহিত করছি। প্লিজ অয়ন, আমাকে আর ঝুলিয়ে রেখো না। তোমাকে ছাড়া আমি কিছুই কল্পনা করতে পারি না। আই লাভ ইউ অয়ন।

চিরকুট পেয়ে যেন নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। নিজেকে রোমিও ভাবতে খুব ভালো লাগলো। এভাবে নূপুরের সঙ্গে আমার ভালোলাগা পর্বের সমাপ্তি হলো। এই পর্বটা অসাধারণ ছিল। কারণ বাথরুম কানেকশনে আমার জুলিয়েটকে পেয়েছি।

নওগা থেকে

দীপাখালা

–নিলয়

তার নাম দীপা। মায়ের আপন বোন না হলেও সে আমার খুব বেশি দূরসম্পর্কের খালা নয়। আবার সে সমরেশের দীপাবলী বন্দোপাধ্যায়ও নয়। সে আমার হৃদয়পুরের একমাত্র রাজকন্যা। আমার দীপাখালা।

আমরা দুজন প্রায় সমবয়সী। খালা–ভাগ্নে কিংবা মামা–ভাগ্নির সম্পর্ক যেমনি হয় তেমনটাই কেটে যাচ্ছিল আমাদের দিনগুলো। সমবয়সী হওয়ার সুবাদে আমাদের মানসিক মিল ছিল বহু ক্ষেত্রে। মোট কথা, আমরা খুব ভালো বন্ধুও ছিলাম। একে অন্যকে বুঝতে পারতাম। এবং দুজনেই খুব ফৃ ছিলাম। গত বছর নভেম্বরের প্রথম দিকে একদিন আমরা পাশাপাশি বসে টিভি দেখছিলাম। আর এটা–সেটা নিয়ে টুকিটাকি কথা বলছিলাম। এর মধ্যে এক সময় দীপাখালা আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো, মামাকে একটা আদর দিতে ইচ্ছা করে।

আমি আপত্তি জানালাম। কারণ একদিন দুষ্টুমি করে খালাকে বলেছিলাম তোমাকে একটা চুমু দেবো। তখন সে বলেছিল ওসবের নাকি বয়স পেরিয়ে গেছে। যদিও সেটা ছিল নিছক ফাজলামো তবুও সে কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললাম, হবে না।

কথা এটুকুই। এরপর আবার টিভি দেখছিলাম আর তার কথাটা ভাবছিলাম। হঠাৎ সে আমার দিকে ঝুকে পড়ে তার নরম ঠোটে আমার কপালের ঠিক মাঝখানটায় ছোট্ট একটা চুমু একে দিল।

আমি শিহরিত হলাম। সেই সঙ্গে পুলকিত। কারণ যৌবনে পা দেয়ার পরে এটাই ছিল কোনো নারীর কাছ থেকে পাওয়া প্রথম চুমু!

দীর্ঘক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার মামাকে এতো ভালোবাসো?

জবাবে সে লাজুক হাসি হেসে উপরে নিচে শুধু একবার মাথা নাড়তে পেরেছিল। কি যে এক ভালোলাগা আমাকে তখন আচ্ছন্ন করেছিল তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। আমিও সেদিন তাকে জানিয়েছিলাম আমার ভাবনাগুলোর কথা যেগুলো ও সম্পর্কে আমার খালা হওয়ার কারণে মনের কোণে জমা হয়েছিল। সেদিন আমি ভুলে গিয়েছিলাম সে আমার খালা।

দুজনেই অনেকক্ষণ চুপচাপ। জিজ্ঞাসা করলাম, আমারটা?

না বোঝার ভান করে সে জানতে চাইলো, কি?

বললাম, এড়িয়ে গেলে চলবে না, সময় মতো সুদ–আসলে আদায় করে নেবো।

সে বললো, ইশ!

সেদিন সে পর্যন্তই শেষ।

একদিন একটা কাণ্ড বাধিয়ে ফেললাম। বললাম, একটা টাইটানিক মানে গভীর চুমু দেবো।

সে বললো, হবে না।

কিন্তু তার আচরণে মনে হয়েছিল এমনিতে দেবে না তবে জোর করলে বাধা দেবে না। সেভাবেই এগোনোর চেষ্টা করলাম। সে মুখ খুললোই না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখতে পেলাম তার নিচের ঠোটে রক্ত জমে গেছে। সেদিন যতোটা লজ্জা পেয়েছিলাম নিজের কৃতকর্মের জন্য জীবনে আর কখনো ততোটা পাইনি। বাসার কারো চোখে পড়লে কে কি ভাববে এই ভেবে শংকিত হলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ জানতে চাইলে কি জবাব দেবে?

সে বললো, সেটা আমার ব্যাপার, আপনাকে ভাবতে হবে না। শুধু দয়া করে তাড়াতাড়ি বাসায় চলে যান।

আমি চলে এলাম। সারাটা দুপুর বিকেল অপরাধ বোধ আমাকে গ্রাস করছিল।

বিকেলে সে আমাদের বাসায় হাজির হলো। আমার দিকে চেয়ে বললো, কেন এমন করলেন, জোর করে কি কারো ভালোবাসা পাওয়া যায়?

তার প্রশ্নের জবাব দিতে পারলাম না। এরপরে তার অন্যান্য দুই একটা কথার দায়সারা জবাব দেয়া ছাড়া কোনো কথা বললাম না। সেদিন আমাকে বিষণ্ন দেখে সে নিজেও কষ্ট পেল।

পরের দিন সকালবেলা তাদের বাসায় গেলাম। সে আমাকে বললো, দেবেন না?

কি? জিজ্ঞাসা করলাম।

কাল যা দিতে চেয়েছিলেন, তাই।

কাল যখন নাওনি আজ নিতে চাইছো কেন?

আপনি মন খারাপ করে থাকেন তা আমি সইতে পারি না।

তবুও থাক না ওসব।

না, থাকবে না দিতে হবে।

দিতে পারি। তবে একটা শর্ত মানতে হবে।

কি সেটা? আমি রাজি।

লিপস্টিক পরে এসো।

দীপা ভেতরের রুমে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে লাজে গলে পড়ে মাথা রাখলো আমার বুকের ওপর। তার কপাল থেকে এলোমেলো চুলগুলো গুছিয়ে দিলাম।

তার চাওয়া পূরণ হলে কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করলাম, কাল তাহলে এ রকম করলে কেন?

জবাবে সে বললো, আপনি যদি আরো বাড়তি কিছু চেয়ে বসেন সেই ভয়ে।

কিন্তু যাকে এতো ভালোবাসি তার এতো বড় ক্ষতি কি আমি কোনদিনও করতে পারবো? তাকেও সেদিন এই প্রশ্নটা করেছিলাম।

সে বললো, তবুও ভয় করছিল।

এখন ভয় করে না?

না।
তবুও সাবধানে থেকো, সাবধানের মার নেই।
পারিবারিক সহযোগিতা করতে গিয়ে তার বেশ খাটতে হয়। প্রায়ই ক্লান্ত থাকে। তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিরক্ত না করার চেষ্টা করি। বিচ্ছিন্ন ব্যাপারে তাকে তাচ্ছিল্য করি। খেপাই, এমনকি মার পর্যন্ত দিই। তবুও কিছু বলে না। কারণ সে জানে আমি তাকে কতোটা ভালোবাসি।
আমি চাই অন্য পাচটা মেয়ের মতো তারও বর আসুক, ঘর হোক। তখনো আমি তাকে ভালোবেসে যাবো। হয়তো আদর করতে চাইবো না। সেটা সম্ভবও হবে না। কারণ ভালোবাসলেও সে আমার খালা, আমার দীপাখালা।

বাকেরগঞ্জ থেকে

ভ্যালেন্টাইনস জ্বর

– সাদেক

তখন ছিলাম বেকার। বাড়িতে বসে বসে পরিকল্পনা করতাম কার সঙ্গে প্রেম করা যায়। কোনো কাজ নেই, সেহেতু ওই একটি মাত্র কাজই আমাকে ব্যস্ত রাখতো প্রতিনিয়ত। সকাল–বিকেল–রাত এভাবে চলছে নীরব অভিসার।
আমার এক প্রেমিকা ছিল খুবই রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে। তার সঙ্গে দিনের আলোতে কথা বলা তো দূরের কথা, স্কুলে যাওয়া–আসার সময় তার দিকে তাকানো পর্যন্ত যেতো না। এর মাঝে দিন চলতে চলতে হঠাৎ একদিন এলো ভ্যালেনটাইনস ডে অর্থাৎ ভালোবাসা দিবস। তাই আমার রক্ষণশীল প্রেমিকা ছোট্ট একটি চিরকুটের মাধ্যমে খবর দিল আজ রাতে অবশ্যই দেখা করতে হবে।
আমি সেই প্রেক্ষিতে বলে পাঠালাম ১১টায় আসবো তাদের বাড়ির পেছনে কলা বাগানে।
গ্রামের রাত এগারোটা অর্থাৎ অনেক গভীর রাত এবং নিঝুম নীরবতা। কোনো রকম এদিক–ওদিক সময় কাটিয়ে ঠিক এগারোটায় পৌছে গেলাম সঠিক গন্তব্যে। তারপর স্যানডাল জোড়া মাটিতে রেখে বসে পড়ি আর প্রিয়তমার আসার অপেক্ষা করছি।
এই অবস্থায় শুরু হলো মশাদের উৎপাত এবং কুকুরের ঘেউ ঘেউ চিৎকার। মশার কামড়ে একটু নড়েছি তো কুকুরটা ঘেউ করে চিৎকার শুরু করে দেয়। তাই কোনো প্রকার নড়াচড়া ছাড়াই মশার কামড় সহ্য করছি খুব কষ্ট সহকারে। অপরদিকে আমার প্রিয়তমাও আসছে না। সে এলে হয়তো কুকুরের চিৎকার থামানো যেতো যেহেতু কুকুরটা তাদের বাড়িতেই পোষা।
যাক, এদিকে আমার অবস্থা অত্যন্ত করুণ। বাড়িতে চলেও আসতে পারছি না আবার মশার কামড়ও সহ্য করতে পারছি না। চোখের পানি ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। অনেক কষ্টের অবসান হয়ে এক সময় ভোর হলো। চারদিকে একটু একটু আলো দেখা যাচ্ছে। কুকুরও ঘেউ ঘেউ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। মশাদের উৎপাতও আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। তাই আমিও ক্লান্ত

শরীরে রওনা দিলাম বাড়ির পথে। তারপর দিলাম এক মহাঘুম। ঘুম থেকে জেগে অনুভব করলাম আমি আর নড়াচড়া করতে পারছি না। অর্থাৎ শরীরে খুব বেশি ব্যথা অনুভব করছি।

মাকে ডাকলাম, তিনি মাথায় হাত দিয়ে বুঝতে পারলেন আমার শরীরের তাপমাত্রা বেশি। তাই ডাক্তার ডাকা হলো। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে জানালেন আমার ম্যালেরিয়া হয়েছে।

এই অবস্থায় পাচ সাত দিন ছিলাম।

প্রতি বছর ১৪ ফেব্রুয়ারি এলে আমার ম্যালেরিয়া জ্বরের কথা মনে পড়ে এবং সঙ্গে সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। তাই ওই জ্বরের নাম দিয়েছি ভ্যালেনটাইনস জ্বর যা আমার আজীবন মনে থাকবে।

চকরিয়া, কক্সবাজার থেকে

অম্লমধুর

– মোহাম্মদ বুলবুল আহমেদ

ঘুম হচ্ছিল না। কিছুক্ষণ আগেই দেয়াল ঘড়িটা শব্দ করে জানিয়ে দিল যে, ১৪ ফেব্রুয়ারির ভালোবাসা দিবস শুরু হয়ে গেছে। তাই বার বার মনে পড়ছিল তাকে। তার সেই মিষ্টি চেহারা, দুষ্ট হাসি, কারণে–অকারণে ঝগড়া, মন কষাকষি আর মধুময় মান অভিমানের কথা ভাবতে ভাবতে রাত দ্বিপ্রহর শেষ হলেও আমার চোখে যেন উজ্জ্বল, হৃদয় আলো করা, চাদমাখা রূপটি জ্যান্ত ভেসে বেড়াচ্ছিল। হয়তো শয়তানের বেশি বাড়াবাড়িতেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। ভালোবাসার মানুষ নাকি মৃত্যুর পরেও হৃদয় কুরে কুরে খায়। এ জন্য ঘুমের মাঝেও বোধহয় সে আমাকে খেতে বসেছে। হঠাৎ দেখতে পেলাম পুষ্প সজ্জিত একটা কার আমাকে নিয়ে চোখ ঝলসানো এক অট্টালিকার সামনে এসে দাড়ালো। আমার বুঝতে বাকি রইলো না যে এটা আমারই নতুন বাড়ি। নতুন বাড়িতে সোফায় অধীর আগ্রহে বসে আছে আমারই নববিবাহিতা স্ত্রী, স্ত্রী নয় জীবন, আমার প্রেমের ধন, আমার ভালোবাসার স্বর্গীয় রানী।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি রানী, মুখ শুকনো কেন? অসুখ করছে নাকি?

সে না সূচক উত্তর দিয়ে এমনভাবে ঘুরে দাড়ালো যে, তার আচল আমার মুখে এসে আঘাত করলো। সে আঘাতে যেন আমার রানীর মাঝে হারিয়ে গেলাম। শাড়ি ধরে টান দিয়ে তাকে আরো কিছু নিয়ে এলাম। হঠাৎ সে যেন বিদ্রোহী কণ্ঠে বলে উঠলো, ডোন্ট টাচ, প্লিজ!

আমি হতবাক! যাকে এতো আদর করে কাছে টানলাম, সে কি না...! তবুও ধৈর্য ধরলাম, তার ওপর তেমন রাগ করলাম না। আসলে তার এ রকম বাড়াবাড়ি অনেক দেখেছি।

যাহোক, এর কারণ জানতে চাইলে সে আরো বেশি রাগান্বিত কণ্ঠে বলে উঠলো, তুমি প্রতিদিন অন্য মেয়ের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ঘরে ফেরো, আমার কথা তোমার মনে থাকে না, তাই না? ঘরে বৌ থাকতে অন্য মেয়ের সঙ্গে টেলিফোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতে লজ্জা করে না? তবে আমার সঙ্গে প্রেম করেছিলে কেন, হ্যা? আমি এক্ষুণি বাড়ি চলে যাবো, তোমার সংসারে আর থাকবো না। নির্লজ্জ পুরুষ, অন্য মেয়ের হাতের রান্না টেস্ট করতে যায়।

ইত্যাদি নানান বাক্যালাপ শুরু করে দিয়েছে রানী। রাগে আমার সারা শরীর যেন জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমার রানীকে এই মুহূর্তে গলা টিপে মেরে ফেলি। কিন্তু আমি রাগ হজম করতে জানি। তাছাড়া সে আমার এতোদিনের প্রেম, তাকে কিভাবে মেরে ফেলি। তার ওপর সামান্য রাগ করতেও আমার মায়া হয়।

যাহোক, সে বক বক করেই চলেছে। আমি নাকি তাকে কথা দিয়ে কথা রাখি না। আমি নাকি লুচ্চা, বদমায়েশ, আমার ভেতরটা পচা, আমি খারাপ ইত্যাদি যা মুখে আসে তা বলে যখন গালি দিতে লাগলো তখন আর সহ্য করতে পারলাম না। ঠাস করে তার চুলের মুঠি ধরে বেডরুমে নিয়ে গেলাম। নানান ভাষায় সে আমাকে গালি দিয়ে যাচ্ছে। আমি কষে কষে তার দুই গালে কয়েকটা থাপ্পড় দিয়ে বিছানায় ফেলে দিলাম। থাপ্পড় খেয়ে সে যেন আরো বেশি ভয়ংকর হয়ে উঠলো। চোখ-মুখ দিয়ে মনে হয় আগুন বের হচ্ছিল। কোনো কথাই যেন সে বলতে পারছিল না। আমি চুপ করে বিছানায় বসে রইলাম।

রানী কাপড়-চোপড় গোছাচ্ছে এবং বিড় বিড় করে বলছে, এমন বদমায়েশের বাড়িতে আর এক মুহূর্তও থাকতে চাই না। এক্ষুণি বাড়ি চলে যাবো। বাবার বাড়ি আমার কিসের অভাব? কি গুণের স্বামী রে! বৌয়ের গায়ে হাত তোলে। তোর সংসার আর আমি করবো না।

বকাবকি করতে করতে বৃফকেস নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলো। দরজার কাছাকাছি যেতেই একটু রাগান্বিত কণ্ঠে বললাম, দাড়াও।

সে অমনি দাড়িয়ে গেল। তার সামনাসামনি গিয়ে দাড়ালাম। আমার দিকে সে অশ্রু মিশ্রিত অগ্নিচোখে তাকিয়ে রইলো। তার হাতের বৃফকেসটা অসহায়ের মতো ঝুলছে। বললাম, আমি তো যৌতুক ছাড়া বিয়ে করেছিলাম। তাই আমার কাছে তোমার কোনো পাওনা থাকার কথা না। কিন্তু তোমার কাছে আমার কিছু পাওনা আছে। যাবার আগে সে পাওনা মিটিয়ে যাবে না?

সে কোনো ইতস্তত না করে চট করে বলে উঠলো, কি পাওনা আছে বলো। এই মুহূর্তে সব পাওনা মিটিয়ে দেবো।

বেশ। তবে বাধা দিও না। এই বলে তার মাথাখানি আমার দুই হাতে জড়িয়ে ধরে ঠোটে আলতোভাবে কামড় দিলাম, সে বাধা দিল না। বেশ কিছুক্ষন ঠোটে ঠোটে মাখামাখি হয়ে গেল। চুমুতে চুমুতে ঠোট একেবারে রসালো হয়ে গেছে। তার হাতের বৃফকেসটা থপাস করে মাটিতে পড়ে গেল। বুঝতে পারলাম তার শরীর নেতিয়ে পড়ছে। তাই বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে বিছানায় নিয়ে গিয়ে বসালাম। কারো মুখে কোনো কথা নেই, সে এক মধুময় নীরবতা।

অনেকক্ষণ এভাবে স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করার পর প্রশ্ন করলাম, বাপের বাড়ি যাবে না?

রানী মুচকি হাসি দিয়ে আমার বুকের মাঝে মুখ লুকিয়ে বললো, ভ্যালেনটাইনস ডে-তে স্বামী ছেড়ে কি করে যাই বলো, অন্যদিন ঠিকই যাবো।

চট্টগ্রাম থেকে

– আকাশ এম.কে চৌধুরী

সময়টা ১৯৭৭ সাল। সবেমাত্র এসএসসি পাস করে মফস্বলের একটি কলেজে ভর্তি হয়েছি। বয়স মাত্র পনেরো বছর পূর্ণ হওয়ার পথে। সদ্য কলেজে ভর্তি হওয়ার আনন্দে বাকবাকুম অবস্থা। সদ্য যৌবন প্রাপ্ত বালিকাদের নাক, মুখ, বুক, চোখ দেখার জন্য অবর্ণনীয় এক প্রতিযোগিতা। ক্লাস থাক আর না থাক, কলেজে উপস্থিত হতেই হবে। নতুন গজানো দাড়ি গোফের মতো, মুখে না থাকলেও শেভ করতে হবে। কলেজ জীবনের পুরোটাই একটা উচ্ছলতার মধ্যে কাটিয়েছিলাম। মফস্বলের কলেজ হলেও আধুনিকতার ছোয়া ছিল শহরতলিতে অবস্থানের কারণে।

কলেজ জীবনে প্রথম কো–এডুকেশনের স্বাদ পাওয়াতে অন্য এক জগতের সন্ধান পেয়েছিলাম যে জগতের সঙ্গে আমার পরিচিতি ছিল খুবই কম। অবশ্য এগারো বছর বয়সে এক যৌবনবতী বালিকা আমার স্বাদ নিয়েছিল। কিন্তু বয়স অল্প ছিল বলে তার স্বাদ নিতে পেরেছি বলে মনে হয়নি।

পাশের বাড়িতে কোনো বয়স্ক পুরুষ না থাকার সুবাদে তাদের যুবতী বালিকার ইচ্ছার কারণে তার নিরাপত্তার জন্য রাতে আমার থাকার ডাক পড়েছিল। আমি অবোধ বালকের মতো তার পাশে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তার স্পর্শে আমার ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর উপলব্ধি করলাম আমাকে সে চুমুতে চুমুতে অস্থির করে ফেলতে চাইছে। আমি ছিলাম ভয়ে আড়ষ্ট। তবে বেশ পুলকও অনুভব করছিলাম। অবশেষে সেই যুবতী আমাকে নিরাবরণ করেছিল এবং আমার ওপর চড়াও হয়ে তার আদিম ইচ্ছা চরিতার্থ করেছিল। আর আমি বেআক্কেল ছিলাম সন্ত্রস্ত, আড়ষ্ট ও নির্বাক। যাক সে কথা।

কলেজ জীবনে এসে প্রথমবারের মতো বালিকাদের কোলাহল আমার কচি মনে প্রভাব ফেলেছিল। আমার অনুসন্ধিৎসু চোখ বিজ্ঞান বিভাগের শ্যামবর্ণের ঝরা (ছদ্ম নাম) নামের সেই মেয়েটিকে আবিষ্কার করলো কলেজের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী হিসেবে। অতএব বিসমিল্লাহ বলে ভালোবাসার স্বর্গ রচনায় ব্রতী হয়ে গেলাম। বাংলা ও ইংরেজি ক্লাসে আমার কাজ ছিল তার দিকে তাকিয়ে থাকা। তার পেছনের বেঞ্চে বসতে পারলে তার চুলের গন্ধ নেয়া।

বাংলা ও ইংরেজি ক্লাসে স্যারের লেকচার কোনোদিনই শুনতাম না। শুনবো কি করে? আমি যে মজনুর দলে চলে গিয়েছিলাম।

প্রথম প্রথম চোখে চোখ পড়লেই সে ফিরিয়ে নিতো। পরের কয়েকদিন চোখ বড় করে ভয় দেখানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। সবশেষে মুকাভিনয় করে বোঝাতে চাইতো আমার লেসুমি (মেয়েদের দিকে তাকানোকে আমরা *লেসু* বলে আখ্যায়িত করতাম) স্যারকে বলে দেবে। কিন্তু না, কোনো কিছুতেই কোনো কাজ হচ্ছে না।

অবশেষে আমার অধ্যবসায়ের কাছে সে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছিল। সেই শুভদিনে কলেজে গিয়েছিলাম সকাল দশটায়। দেখি কলেজে কোনো প্রাণী নেই। মেয়েদের কমনরুমের সামনে আমার শ্যামলা রঙয়ের সেই ব্ল্যাক ডায়মন্ড প্রেয়সী। খুব মুড নিয়ে তার পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছিলাম।

সেই প্রথম কথা বললো। চৌধুরী সাহেবের কি আজ প্র্যাকটিকাল আছে?

উত্তরে বললাম, জি আছে, যুক্তিবিদ্যার প্র্যাকটিকাল।

যুক্তিবিদ্যার প্র্যাকটিকাল আছে! আজই প্রথম শুনলাম।

জীববিদ্যার প্র্যাকটিকাল থাকতে পারলে যুক্তিবিদ্যার থাকতে দোষ কোথায়?
দেখতে তো পিচ্চি মনে হয়। কিন্তু কথা তো চটাং চটাং। শিখেছেন কোথায়?
ছোট মরিচের ঝাল বেশি, এটা নিশ্চয়ই অজানা নয়।
এভাবে চটুল বাক-বিতণ্ডার এক পর্যায়ে হাতে থাকা একটা আমলকি এগিয়ে দিয়ে বললো, আমলকিতে ভিটামিন সি আছে। মুখের ব্রন চলে যাবে।
বললাম, মুখের ব্রন আমলকিতে যাবে। কিন্তু মনের শান্তি কি দিয়ে আসবে, এটা বলুন না?
এবার সে সিরিয়াস হয়ে বললো, আমি চার পাচ মাস যাবৎ লক্ষ্য করছি আপনি আমাকে ফলো করেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে ধর্ম নামের যে বিশাল দেয়ালের ব্যবধান তা ডিঙানো যে কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সুতরাং এ সব পাগলামো করা কি ঠিক হচ্ছে?
হ্যা, আমার সেই ব্ল্যাক ডায়মন্ড ছিল বুড্ডিস্ট। বললাম, তুমি তো আমাকে পাগলই করেছো, পাগল তো ধর্ম-কর্ম করে না, বোঝেও না। সুতরাং পাগলের জন্য ধর্মের দেয়াল ডিঙানো কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়। এখন তোমার চিন্তা ভাবনা কি তাই বলো।
সে বললো, আমি কোনো চিন্তা করিনি। আমাকে কিছুদিন সময় দাও।
এরপর কলেজের ক্লাসের ফাকে, ক্লাস শুরুর আগে আমাদের কথাবার্তা হতো। অবশ্য কোনোদিনই সীমা অতিক্রম করিনি।
সেকেন্ড ইয়ারে সে একদিন বললো, তার মা আমাকে দেখতে চেয়েছেন।
একদিন বন্ধু ব্রজেন্দকে (ছদ্মনাম) নিয়ে হাজির হলাম স্বপ্নের সে কুড়ে ঘরে। ছোট্ট একটা ছনের ঘরে সে আর তার চাকরিজীবী মা থাকেন। বাবা নেই। এক ভাই নিরুদ্দেশ। ঘরে প্রবেশ করতেই চোখে পড়লো বিশাল ফ্রেমে বাধা গৌতম বুদ্ধের ছবি। দেখেই ধরে নিলাম এমন ধার্মিক মায়ের মেয়েকে আমার মতো বিসমিল্লাহ বলা ছেলের হাতে কখনোই তিনি তুলে দেবেন না। তবুও দোয়া-দরুদ পড়ে ঘরে ঢুকে বসে পড়লাম।
প্রথমে জিজ্ঞাসা করলো, কেমন আছো?
বললাম জি ভালো আছি। রান্নাঘর থেকে আমার ব্ল্যাক ডায়মন্ডের হাসির শব্দ পেলাম। তিনি নাশতা তৈরির কাজে ব্যস্ত। হাসির কারণ অবশ্য পরে জেনেছিলাম। তারা জি শব্দের সঙ্গে তেমন পরিচিত নয়। জি শব্দটি মুসলিমদের ভাষা। আমি জি বলাতেই সে হেসে ফেলেছিল।
নাশতা এলো। ঝালমুড়ি, বিস্কিট, চানাচুর, চায়ের কাপে গরুর দুধ। নাশতা দেখে মেজাজ বিগড়ে গেলেও প্রেয়সীর হাতের ঝালমুড়িকে সন্দেশ মনে করেই খেলাম। নাশতার পর শুরু হলো জ্ঞানদানের পালা।
তার মায়ের জ্ঞানের যার কথা হলো, লেখাপড়া শিখে মানুষ হও, মা বাবার মুখ উজ্জ্বল করো। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হও, অনেক সুন্দর সুন্দর মেয়ে তোমার জন্য পাগল হবে। আমার মেয়ে তো কালো। সবচেয়ে বড় কথা হলো, তোমার ধর্ম ইসলাম, আমাদের ধর্ম বৌদ্ধ। এই ধর্মের বাধা অতিক্রম করা সম্ভব নয়, সমাজ এটা মানবে না। আমাদেরকে, তোমাকে সমাজচ্যুত করবে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে বিয়ে করার কারণে সারাটা জীবনই তোমাদের অপমানের ঘানি টানতে হবে। তবে হ্যা, তুমি আমার ছেলের মতোই আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে।

আমি স্ট্যাচু-র মতো নির্বাক থেকে তার জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনলাম। আশাভঙ্গের বেদনায় আমার বুক ফাটা কান্না কোনো প্রকারে সংবরণ করলাম। প্রায় দুই ঘণ্টা পর তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। আসার সময় প্রেয়সীকে দেখলাম দরজার আড়ালে অশ্রুসজল চোখে তাকিয়ে আছে। বুঝলাম ইতিমধ্যে সেও আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে।

দুই দিন ভীষণ কষ্টে কাটালাম। কলেজে গেলাম না। তৃতীয় দিন কলেজে গেলাম একটু আগে। দেখলাম সে আমার আগেই এসেছে। তাকে নিয়ে দোতলায় উঠলাম। বললাম, আমি এখন কি করবো? আমার পাগলামি তো ফাজলামো নয়। আমি তো সত্যি সত্যিই প্রেমের পাগল। আমি যদি ধর্মের বাধা ডিঙানোর সাহস করতে পারি তাহলে তুমি কেন পারবে না?

সে কোনো কথা বললো না, মুখ নিচু করে তাকিয়ে থাকলো।

চিবুকে হাত দিয়ে তার মুখটা তুলে ধরলাম। দেখলাম তার চোখে পানি। তাকে বুকে টেনে নিলাম। চোখের পানি মুছে দিলাম। জীবনে প্রথম কোনো নারীকে চুমু খেলাম।

আমার আদর পেয়ে সে ডুকরে কেঁদে উঠলো। নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, তোমাকে কি রকম ভালোবাসি তা বুঝিয়ে বলতে পারবো না। তোমার জন্য মায়ের সঙ্গে প্রতি রাতেই ঝগড়া হয়। তবুও মায়ের অবাধ্য হতে পারবো না। কারণ বাবার স্নেহ আমি পাইনি। আমার কাছে মা-ই সব। সুতরাং মা যা চাচ্ছেন বা চাইবেন তার বাইরে কোনো কিছু করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। মায়ের বক্তব্য হলো, ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে তিনি বেইমানি করতে পারবেন না। জীব হত্যা মহাপাপ। জেনেশুনে তিনি কোনো জীব হত্যাকারীর হাতে মেয়েকে তুলে দিতে পারবেন না।

বললাম, তিনি ধর্মটাকে বড় করে দেখলেন। মনুষ্যত্বকে বড় করে দেখলেন না। এটাই আমার কাছে বড় দুঃখ হয়ে থাকবে।

এরপরও আমাদের মেলা-মেশা, কথা-বার্তা কখনো বন্ধ ছিল না। এতো কিছুর পরও আমার অবুঝ মন তাকে নিয়েই স্বপ্ন দেখতো। মনে করতাম হয়তো একদিন তার মা আমাদের সম্পর্কটা মেনে নেবেন।

এভাবেই আশা-নিরাশার মধ্যে এইচএসসি পাস করলাম। দুজনেই চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে অনার্স কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা দিলাম। সে ভর্তি হলো বাংলায়, আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে। ক্লাস শুরু হওয়ার প্রথম আনন্দের দিনেই তখনকার সময়ে আমার জীবনে দুঃখজনক সংবাদটি শুনেছিলাম। ঝরা প্রথম দিন ইউনিভার্সিটিতে এসেই সাত দিন পর স্থানীয় সরকারি চাকুরে এক ব্যক্তির সঙ্গে তার বিয়ের তারিখের সংবাদ আমাকে জানালো। মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়েছে, এমনই আঘাত পেয়েছিলাম সেদিন।

ঝরা আমাকে অনেক বোঝাতে চাইলো। সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়ে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করতে বললো। যদি সত্যিই তাকে ভালোবাসি তাহলে দুজনের মঙ্গলের জন্য বাস্তবতাকে মেনে নেয়ার অনুরোধ করলো। ভবিষ্যতে নৈতিকতার আলোকে সম্পর্ক রক্ষা করার অঙ্গীকার করলো।

তাকে শুকনো ধন্যবাদ জানালাম। তার শুভ কামনা করলাম। ধর্মের কাছে পরাজিত হয়ে ভালোবাসার ছোট্ট এক অধ্যায়ের সমাপ্তি টেনে তাকে ট্রেনে তুলে দিলাম। মনে হলো কি যেন হারিয়ে ফেলেছি।

ঝরা চলে গেল আমার জীবন থেকে। অবুঝ মনে হঠাৎ করে উদয় হওয়া অপরিণত ভালোবাসা হঠাৎ করেই নীল আকাশে মিলিয়ে গেল। ছয় বছরের ইউনিভার্সিটি জীবনে সেশনজটসহ তার স্মৃতিকে বুকে

ধারণ করে আর কাউকে স্থান দিতে পারিনি। ভালো ছাত্রের সুনাম থাকার কারণে এক সহপাঠিনী ভীষণ বিরক্ত করলেও ভালোবাসার অমর্যাদা হবে ভেবে তাকে প্রশ্রয় দিইনি। অবশেষে মেধা তালিকায় স্থান নিয়ে অনার্সসহ এমএ পাস করে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিয়েছিলাম।

মা, বাবার অনুরোধ ও সুন্নত পালনের জন্য বিয়েও করেছি। আমাদের সংসারে এসেছে প্রাণপ্রিয় দুই সন্তান। জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এসেছে। গ্রামের সেই পিচ্চি ছেলেটিকে আজ চট্টগ্রাম শহরে অনেকে চেনে। নিজের প্রচেষ্টার অর্জনে আজ আমি সন্তুষ্ট। এতো কিছু প্রাপ্তির মধ্যেও এখন অলস অবসরে তাকে মনে পড়ে।

একই শহরে থাকি বলে তার সঙ্গে দেখাও হয়, কথাও হয় সামান্য। তার স্বামীর বয়স হয়েছে। কিছুদিন পর চাকরি থেকে রিটায়ার করবে। বড় ছেলে এইচএসসি পরীক্ষা দেবে। মেয়ে এসএসসি পাস করেছে। দেখে মনে হয় তার মধ্যেও শূন্যতা আছে। তার মা বেচে আছেন। আমাকে দেখতে চান মাঝে মধ্যে। আমি সময় করতে পারি না বলে যাওয়া হয় না।

অলস অবসরে যখন তার কথা মনে পড়ে তখন ভাবি, আসলেই আমরা সবাই অবচেতন মনে স্ব স্ব ধর্মকে ধারণ করে থাকি। সেদিনের আমার স্বল্প বয়সী আবেগের কারণে ধর্মের বাধা অতিক্রমের যে দুঃসাহস দেখিয়েছিলাম আজ পরিণত বয়সে মনে হচ্ছে, সেদিনের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না। সেদিন যদি ঝোকের বসে তাকে বিয়ে করতাম তাহলে আজকের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতো না। বড়জোর কেরানি হয়েই থাকতে হতো। First you deserve, then you desire. এই আপ্তবাক্যটি সকলে যদি মনে রাখে এবং মেনে চলে তাহলে সমাজ অনেক দুর্ঘটনা থেকে মুক্ত থাকবে।

চট্টগ্রাম থেকে

চিঠি

– মাধবী ইয়াসমিন

আমি যখন ইন্টারমিডিয়েট পড়ি তখন এন নামের একটি ছেলের সঙ্গে পরিচয় হয়। অবশ্য সে আমার উপরে পড়তো। পরিচয়ের সূত্র ধরে সে একদিন আমার কাছ থেকে একটি গল্পের বই নেয়। পরের দিন সে বইটি ফেরত দিয়ে বললো, বাড়ি গিয়ে বইটি খুলবে।

বইটি বাড়ি গিয়ে খুলবো কেন?

প্রশ্নটি শুনে সে বললো, কিছু তো একটা আছে।

অজানাকে জানার যে কৌতূহল তখন আমার মধ্যে হচ্ছিল তা কাউকে বোঝাতে পারবো না। আমি আর কোনো কথা না বলে, বইয়ের মধ্যে কি আছে জানার জন্য দ্রুত কলেজ থেকে বাড়ির পথ ধরলাম। মনের মধ্যে অনেক কথা উকি-ঝুকি মারছিল, তারপরও বুঝতে পারছিলাম না কি আছে। এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি নিয়েই বাড়ি ফিরলাম। ঘরে ঢুকে বই-খাতা টেবিলে রেখে গল্পের বইটি চোখ

বন্ধ করে খুললাম। চোখ খুলে কাগজটি খুলতেই বুকের মধ্যে একটা বরফ শীতল পরশ বুলিয়ে গেল, সেই সঙ্গে হৃদকম্পনও বেড়ে গেল।

চার পৃষ্ঠার ইয়া বড় চিঠি। আমাকে লেখা!

পড়তে গিয়ে মনে হলো, এই বুঝি মা, আপা এসে বলবেন, এই – কার চিঠি পড়ছিস? দেখি তো।

ধরা পড়ার আতংকে ঘরের মধ্যে চিঠি পড়া নিরাপদ না ভেবে অবশেষে টয়লেটে গিয়ে চিঠিটি পড়তে শুরু করলাম।

তখন আবহাওয়া খুবই ঠাণ্ডা ছিল। তবুও চিঠি পড়ায় একেবারে ঘেমে গিয়েছিলাম। জামা দিয়ে হাত মুখের ঘাম মুছে চিঠিটি বুকের মধ্যে করে টয়লেট থেকে ঘরে ফিরলাম। চিঠি পড়া তো কোনো রকম শেষ হলো। এবার চিঠিটি কোথায় রাখবো লুকিয়ে এ চিন্তায় শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম। একবার মনে করলাম, চিঠিটি বালিশের কভারের মধ্যে লুকিয়ে রাখি। তাহলে মা, আপা কেউ জানতে পারবেন না। আবার মনে হলো, যদি ওরা বালিশের কভার খুলতে আসে! তাহলে কি করবো? তাই আবার সিদ্ধান্ত নিলাম, চিঠিটি বিছানার নিচে লুকিয়ে রাখবো। তাহলে কেউ বুঝতে পারবে না।

পরবর্তী কালে চিঠিটি ওখানেও রাখা নিরাপদ না ভেবে অন্য কোথায় যেন লুকিয়ে রাখলাম। কোথায় যে, চিঠিটি লুকিয়ে রেখেছিলাম তা আজো খুজে পাইনি।

ঝিকরগাছা, যশোর থেকে

চিহ্ন

– রুনা ইয়াছমিন

আজ অনেক দিন হয় চাকরি ছেড়েছেন বাবা। পেনশনের সামান্য টাকা দিয়ে কিছু জমি কিনে ছোট একটা বাড়ি করেছেন। দুই ভাই, তিন বোন, বাবা ও মাসহ সাত সদস্যর পরিবার আমাদের। এখন মাস শেষে বাবা পেনশনের টাকা পান মাত্র আঠারশ। দুই ভাই ও দুই বোনের বিয়ে হয়েছে। অভাবের সংসার। তারপরও বোন দুটির শ্বশুরবাড়ি থেকে চাপ আসতো যৌতুকের টাকার। কখনো কখনো কাদতে কাদতে বাড়ি ফিরতো। শরীরের বিভিন্ন অংশে থাকতো আঘাতের চিহ্ন। মনে মনে তখন পুরুষদের খুব ঘৃণা হতো। বড় দুই ভাইয়ের বৌ দুটি থাকতো জমিদারি হালে। তাদের মর্জির ওপর চলতে হতো মা ও আমাকে। বাবাও সব অন্যায় সহ্য করে থাকতেন। কারণ তার একার টাকায় সংসারের কিছুই হয় না।

এরপরও এ সংসারে আছে আমার মতো পোড়া কপালি মেয়ে। গায়ের রঙ কালো হওয়ায় যার বিয়ের কথা ভেঙেছে কয়েকবার। ছেলেপক্ষ দেখতে আসলে যে টাকা খরচ হয় তার খোটাও শুনতে হয় ভাবীদের কাছ থেকে। এভাবে প্রতিনিয়ত কথা শুনতে হয় আমাকে। কারণ আমি সংসারের বোঝা। বিয়ে হয় না, পোড়াকপালি। মা বাবা শুধু আমার কষ্টটা অনুভব করতেন।

ঘরের অভাব এমনিতেই ছাড়ছে না, তার উপর কোথেকে এসেছে আবার বাবার বন্ধুর ছেলে। আমরা শহরে থাকি। তাই আমাদের শহরে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে এসেছে। থাকবে আমাদের বাসায় প্রায়

এক সপ্তাহ। তার ইন্টারভিউ প্রস্তুতি চলার সময়ে তার খাওয়া–দাওয়া ও সকল কাজে সহায়তা করতাম। আমাকে ঘরের অন্যরা বাকা চোখে দেখতো। আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতো। তার কিছুটা সেও অনুভব করতো। আমার জানি তার ওপর কেমন মায়া হতো। মায়া না ছাই! নিজের কান নিজে টেনে ধরে বলতাম, এই চেহারায় আবার রূপবানের পার্ট। নিজেকে শুধু অসহায় লাগে।

সেদিন বাবার বন্ধুর ছেলেটি মিষ্টি নিয়ে বাড়ি ফিরলো। ইন্টারভিউ ভালো হয়েছে, চাকরি নিশ্চিত। সবার মতো আমিও শত দুঃখ নিয়ে একটু হাসলাম তার দিকে তাকিয়ে। অথচ ঘরের সবাই অস্থির কখন সে চলে যাবে, ঘরের বোঝা কমবে। অথচ আমি কাদছি।

সে আমার বাবার ধরে সালাম করলো। আমাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। তারপর সে বাবাকে বললো, আমাকে বিয়ে করতে চায়।

বাবা অবাক! কি বলে এই ছেলে!

সে তার হাতের আংটি খুলে আমাকে পরিয়ে দিল এবং আগামী সপ্তাহে এসে বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করে যাবে বলে সালাম দিয়ে চলে গেল।

সত্যিই পরের সপ্তাহে কথা পাকাপাকি হলো। ঘরের সবাই এখন আমাকে খুব ভালো জানে। মা বাবা বলেন, আল্লাহ যেন তোকে এ দোজখ থেকে রক্ষা করে। দুই ভাবী খুব ভালো জানে। তার কারণ আমি খুব শিগগিরই বাড়ি ছাড়ছি। যে, যে কারণেই আমাকে ভালো জানুক না কেন, আমার খুব ভালো লাগে এখন।

আজ কেন জানি সাজতে ইচ্ছা করছিল। তাই নতুন শাড়ি পরে আয়নায় দাড়িয়ে দেখি আমার কপালে আর কোনো দুঃখের চিহ্ন আছে কি না। কালো হয়ে জন্ম নেয়া ও অভাবের সংসারে কতোটা কষ্ট তা আমি বুঝি। তাই করুণাময় আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাই, শত দুঃখের পরেও সে আমাকে সুখের ছোয়া দিল। দুঃখকে ভরালো ভালোবাসা দিয়ে।

পশ্চিম পিঙ্গলকাঠি, বরিশাল থেকে

তাবিজ

আমার দাদা জেনারেল এরশাদের মতো প্রেমিক পুরুষ ছিলেন। দীর্ঘ নব্বই বছরের জীবনে বেশ কয়েকটি বিয়ে করেছিলেন। বিয়ে ছাড়াও অনেক সরস প্রেমলীলা তার নিজ মুখেই শুনেছি। সত্যি–মিথ্যা জানি না।

আমার দাদি ছিলেন বড় বৌ। খুব সহজ–সরল ও পতিব্রতা ছিলেন বলেই দাদা এসব কান্ড করার সুযোগ পেয়েছিলেন। দাদার এই সব ব্যাপার আমাদের কাছে মজার হলেও আমার বাপ–চাচাদের জন্য খুবই বিব্রতকর ছিল। তারা দাদাকে কিছু বলতেও পারতেন না আবার সইতেও পারতেন না। আমার বাবা কিছু বলতে গেলেও দাদির কারণে বলতে পারতেন না।

দাদি মারা যাবার পর দাদা কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়লেন। দাদার অন্যান্য বৌদের কাউকে কাউকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলা হলো। কেউ বা বয়সের কারণে মারা গেলেন।

এসব ঘটনা সবই আমার জন্মের আগে ঘটেছে। দাদার মুখেই বেশির ভাগ শুনেছি। দাদার শেষ জীবনটা কেটেছিল আমাদের বাসায়। নারীসঙ্গ বঞ্চিত দাদা আমার সঙ্গেই ঘুমাতেন।

আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে সীমাহীন আগ্রহ আমার।

দাদা একজন আগ্রহী শ্রোতা পেয়ে গল্পের ঝাপি খুলে দিতেন।

দাদাকে জিজ্ঞাসা করতাম, এক সঙ্গে এতোজন বৌকে তিনি সামলাতেন কেমন করে?

আমার শিক্ষিত দাদা স্মার্টলি বলতেন, তোদের এরশাদের চেয়ে আমার পাওয়ার অনেক বেশি।

এরশাদ তো সুন্দর। কিন্তু আপনি তো অতো সুন্দর না। তবুও মেয়েরা আপনার কাছে আসতো কেন?

দাদা রহস্যময় হাসি হেসে বলতেন, আমার কাছে একটা তাবিজ আছে।

কথাটা স্রেফ চাপাবাজি বলে মনে হতো। তবুও দাদাকে খুশি করার জন্য বলতাম, দাদা, আমাকে তাবিজটা দেবেন?

দাদা বলতেন, আমার সেবাযত্ন করে যা। সময় হলে তোকেই তাবিজটা দিয়ে যাবো।

আমার এসএসসি পরীক্ষার মাস দুয়েক আগে দাদা মারা গেলেন। পরিণত বয়সের স্বাভাবিক মৃত্যু। তাই খুব একটা দুঃখ পাইনি।

এসএসসি-তে বেশ ভালো ফল করলাম। দেশের অন্যতম সেরা কলেজে ভর্তি হলাম। আমার চাচার বাসায় উঠলাম। পরিবারের বেশ ভালো ছাত্র হিসেবে পরিচিত ছিলাম। আমার এক বছরের ছোট চাচাতো বোনটিও মাঝে মধ্যে আমার কাছে পড়তে আসতো। তেমন একটা সুন্দরী ছিল না। তবে ফিগারটা বয়সের তুলনায় বেশি পরিণত ছিল। প্রায়ই সকালবেলা আমার ঘুম ভাঙাতে সে আসতো। সকালবেলা ছেলেদের ওটা সব সময়ই ফুলে থাকে। সে আমার অলক্ষ্যে ওখানে হাত দিতো। এমন ভাব করতো আমাকে জাগাতে গিয়ে হাত লেগে গেছে। আমার বেশ ভালোই লাগতো।

একদিন দুপুরবেলা আমি শুয়ে আছি।

সে এসে খোচাতে লাগলো। দুপুরবেলা ঘুমাতে পারবে না, আমাকে গল্প শোনাও।

বললাম, আমি উঠতে পারবো না, আমার কাছে শুয়ে গল্প শুনতে পারো।

সে দেরি না করে লেপটা উঠিয়ে শুয়ে পড়লো। আমি গল্প বলা শুরু করলাম। কিন্তু বুকের কাছে তরতাজা ষোড়শীর স্পর্শ পেয়ে গল্প আর শেষ হলো না। আমরা দুজনই স্বপ্নের জগতে হারিয়ে গেলাম।

জীবনের প্রথম নারী স্পর্শ। প্রথম প্রেম। দুইজনই ছিলাম আনাড়ি।

কয়েকদিন এ প্রেমের পর দুজনই পাকা খেলোয়াড় হয়ে গেলাম।

একদিন হঠাৎ চাচির হাতে ধরা পড়ে গেলাম। তিনি ব্যাপারটা নিয়ে হই চই করলেন না। আমাদের দুজনকে ডেকে নিয়ে শপথ করালেন। এবং বললেন, আমরা যেন সম্পর্ক না রাখি।

আমি লজ্জায় সেখান থেকে হস্টেলে চলে আসি। এই সব ঝামেলার কারণে এইচ.এস.সি রেজাল্ট বেশি ভালো হয়নি। আমার প্রথম প্রেমিকার সঙ্গেও আর যোগাযোগ রাখিনি।

ঢাকায় চলে এসেছিলাম কোচিং করতে। কয়েকজন বন্ধু মিলে বাসা ভাড়া নিলাম। সবাই ভর্তি পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আমার পড়ায় মন বসতো না। ছাদে গিয়ে বসে থাকতাম। পাশের ছাদে কয়েকটি মেয়ে উঠতো। একটি মেয়ে নিজ থেকেই পরিচিত হলো আমার সঙ্গে।

আমাদের ইয়ারমেট। তবে এসএসসি–র পর আর পড়েনি। মেয়েটির সান্নিধ্য আমার নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে দিল। মেয়েটির সঙ্গে বেশ ফ্রি হয়ে গেলাম।

একদিন দুপুরবেলা সে আমাদের মেসে এসে হাজির। মেসে কেউ ছিল না। পুরনো প্রেমের স্মৃতি আমার মনে পড়ে গেল। তার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ হতে সময় লাগলো না। প্রায়ই চলতে লাগলো আমাদের প্রেমলীলা। পাশের বিল্ডিংয়ে থাকার সুবাদে যখনই সুযোগ পেতাম তার রুমে যেতাম, সে আমার রুমে আসতো।

নিজের পায়ে নিজেই যে কুড়াল মারছি তা বুঝিনি। আমার বন্ধুরা সবাই ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেলো। আমি পেলাম না। হতাশ হয়ে এবং সবাইকে হতাশ করে বাড়ি ফিরে এলাম। স্থানীয় একটি কলেজে ভর্তি হলাম। প্রচণ্ড মন খারাপ থাকতো। কারো সঙ্গে কথা বলতাম না। কয়েকদিন পর খেয়াল করলাম ক্রমেই পড়ায় পিছিয়ে যাচ্ছি। এক বন্ধুর সাহায্য চাইলাম। সে এক মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

মেয়েটি পড়াশোনায় বেশ ভালো। আমাকে নোট দিয়ে সাহায্য করতো। তার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারতাম। সে প্রায়ই সাহস যোগাতো। তবে তার সঙ্গে আমার অন্য রকম কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। দেখতে দেখতে এক বছর পার হয়ে গেল। ভাবলাম আবার ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দিয়ে দেখি। এবার তেমন পড়াশোনা করতে পারিনি। তবুও টিকে গেলাম।

আমার সেই বন্ধুটি অবশ্য বলেছিল, এখানে তো তুমি ভালোই করেছো। যেও না।

তবুও আমি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম। নতুন বন্ধু–বান্ধবীদের ভিড়ে ভুলে গেলাম তাকে। আমার চেয়ে এক বছরের বড় একটি মেয়ের সঙ্গে দ্রুত বন্ধুত্ব হয়ে গেল আমার। মেয়েটির অবশ্য লাভার ছিল। কিন্তু সেই ছেলেটি ইউনিভার্সিটিতে পড়তো না।

মেয়েটির ফিগার ছিল দুর্দান্ত। কথাও বলতো চমৎকার। আমার সঙ্গে ফ্রি হতে তার বেশি সময় লাগেনি। মেয়েটি এনগেজড জেনেও তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলাম। শরীরের খেলায় সে ছিল পারদর্শী। মেয়েটির বাবা মা দুজনই চাকরিজীবী ছিলেন। বাসা খালি থাকতো। ইউনিভর্সিটিতে না গিয়ে আমরা সারাদিন মেতে থাকতাম প্রেমলীলাতে। আমার মনে বিন্দুমাত্র অপরাধ বোধ ছিল না। আমার মনে হতো, সে যদি তার প্রেমিককে ঠকিয়ে আমার সঙ্গে সময় কাটাতে পারে, আমি কেন পারবো না?

একদিন হঠাৎ করে সে জানালো তার প্রেমিককে ছেড়ে দেবে।

বললাম, কেন?

আমি তোমাকেই ভালোবাসি।

আমার মাথায় বজ্রাঘাত হলো। আমি তো তাকে ভালোবাসি না।

সে আমাকে গালি দিয়ে বললো, তুমি তাহলে এমন ঘনিষ্ঠভাবে মিশলে কেন? আমার কি নেই, তুমি আমাকে ভালোবাসো না? তবে কাকে ভালোবাসো?

তার এতো প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারিনি। ভেবে পাই না, কেন মেয়েরা আমার সঙ্গে এতো সহজে ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়। কিন্তু আমি তাদেরকে ভালোবাসতে পারি না।

হঠাৎ মনে পড়লো দাদার তাবিজের কথা।

দাদা আমাকে তাবিজটা দিয়েছিলেন, যার বদৌলতেই হয়তো আমার তেমন কোনোরূপ এবং গুণ না থাকার পরও মেয়েরা আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রতিদান

– সৈকত

মেয়েটির চেহারা বম্বের হার্টথ্রব নায়িকা মমতা কুলকার্নির মতো। পরিচয়ের পর থেকে রসিকতা করে তাকে মমতা কুলকার্নি বলেই ডাকি। বড় ভাইয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে তাকে প্রথম দেখি। আমরা দুই বন্ধু নতুন বৌ দেখার জন্য বৌয়ের ঘরে ঢুকতে চাইলে সে বাধা দেয়। তখন আমার বন্ধু রসিকতা করে বলে ওঠে, চল, চলে যাই, বৌ তো দেখা হয়ে গেছে।

কথাটি যে মেয়েটির উদ্দেশ্যে বলা তা বুঝতে পেরে আমি হাসলাম আর সে লজ্জা পেয়ে দৌড়ে পালালো।

সত্যি তার রূপ দেখে চোখ ফেরানো দায়। স্বয়ং বিধাতা নিজ হাতে তাকে তৈরি করেছেন এমন অপ্সরি করে। সৌন্দর্যের বাস্তব প্রতিমা, দেবী বললেও ভুল হবে না।

অন্য একজনের কাছ থেকে জানলাম, মেয়েটি বৌয়ের আপন ছোট বোন। অর্থাৎ আমার আপন ভাইয়ের শালী। খুশি হতে পারিনি। কেননা তাকে কোনোদিন আপন করে স্ত্রী হিসেবে চাইতে পারবো না। তবুও তাকে ভালোবাসবো প্রতীজ্ঞা করলাম। তবে সে ভালোবাসা হবে নিরেট ভাইবোনের ভালোবাসা।

পরিচয়ের পর থেকেই তাকে তুই সম্বোধন করতে শুরু করি। ইতিমধ্যে সেও আমাকে তার ভাইয়ের আসনে বসিয়েছে। আমার সঙ্গে বেশ খোলামেলা আলোচনা করে সব কিছু নিয়ে। এর মধ্যে জানতে পারলাম তার অনেক দিনের স্বপ্ন নায়িকা হওয়ার। আর এ জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত করছে। অবশ্য তার চেহারা ইতিমধ্যে পত্রিকা মারফত বাংলাদেশের সবাই দেখতে পেয়েছে। সারা দেশ থেকে প্রশংসা ভরা চিঠি, পার্সেল কার্ড পেতে লাগলো।

ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে একটি গিফট নিয়ে তার বাসায় যাই। গিয়ে যা শুনলাম তাতে আমার চোখ চড়কগাছ। এক স্বনামধন্য পরিচালক তার বাসায় এসে তার বেশ কিছু ছবি তুলে নিয়ে গেছে এবং শুটিংয়ের তারিখ জানিয়ে গেছে। সে তো খুশিতে তাধিন ধিন নাচ শুরু করে দিয়েছে। আমি খুশি হতে পারিনি দেখে সে খুব অবাক হলো এবং খুব কষ্ট পেল।

আমি ওই দিনই সরাসরি ঢাকায় চলে আসি এবং যে পরিচালকের নাম সে বলেছিল তাকে খুজে বের করি। জানতে পারি তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। বরং ঈদ উপলক্ষে ব্যস্ত আছেন। তিনি আরো বললেন, এ রকম অসংখ্য দালাল আছে যারা এই সব মেয়েদের দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে ব্যবসা করে। আমি সব কিছু মেয়ের মা বাবার সঙ্গে খুলে বলি। মেয়েটিকে তারা কিছুদিনের মধ্যেই বিয়ে দেন। বর্তমানে সে সুখেই আছে। কিন্তু আমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করেনি। হয়তো কোনোদিন দেখা

হলে কথাও বলবে না। অথচ চরম বিপদের হাত থেকে তাকে বাচিয়ে আমার ভালোবাসার পরিচয় দিয়েছি। ভালোবাসার এই কি প্রতিদান?

ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে

সুসংবাদ

– জোহার জোয়ার

টেবিলের বই খাতা সব এলোমেলো। কুজো হয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে পলাশের খাটে কে যেন শুয়ে আছে। বোঝা যাচ্ছে সম্পূর্ণ ঘরটাকে উল্টে–পাল্টে পুলিশি অভিযান চালানো হয়েছে। প্র্যাকটিস থেকে ফিরে ঘরে ঢুকেই মেজাজের টেম্পারেচার হাই হলো। পলাশের চোখ দুটো দশ টাকা দামের রসগোল্লার সাইজে এনে, গলার আওয়াজটা বাংলা ছবির ভিলেইনের মতো হুংকার করে বললো, মা, চোর... চোর...চোর! কম্বল বরাবর কৃকেট ব্যাট উচিয়ে যেই আঘাত করতে যাবে অমনি পলাশের মা এসে ব্যাটটি ধরে ফেলেন।

কম্বল থেকে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে এক ঝটকায় বেরিয়ে এলো শিউলি। শব্দের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ডাকাত ডাকাত ডাকাত বলে চেচালো শিউলি। পলাশের চোখে চোখ পড়তেই এক লাফে দুই হাতে চুলের মুঠি ধরে চেচানোর আওয়াজ আরো বাড়িয়ে বললো, ধরেছি, ডাকাত, ডাকাত, ডাকাত। রশি দিয়ে বেধে ফেলো।

এবার শিউলির মা দৌড়ে এসে কোনো রকম বুঝিয়ে–সুঝিয়ে পলাশের চুল থেকে শিউলির হাত ছাড়ালেন। ততোক্ষণে পলাশের মা পলাশকে বকাবকি শুরু করলেন। দুজনকে দুই ঘরে নেয়ার সময় শিউলিকে ব্যাট উঠিয়ে পলাশ আবার শায়েস্তা করার ইঙ্গিত দিল।

শিউলিও কম কিসের! গোখরা সাপের মতো ফোস ফোস করে ভেংচি কেটে আগুনে ঘি ঢালার মতো পরিস্থিতি বানিয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য রুমে গেল।

পলাশের মা ও শিউলির মা দুই বোনের চেহারায় দুশ্চিন্তার মানচিত্র ফুটে উঠেছে। একেবারে কেচো খুড়তে সাপের দেখা। যেমন দস্যি মেয়ে তেমনি বাদর ছেলে। কে শোনে কার কথা।

শিউলির ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা শেষ। রেজাল্ট বের হতে তিন মাস বাকি। তাই অনেক বছর পর বড় খালার বাসায় ঢাকা বেড়াতে এসেছে। কাল রাতের ট্রেনে মায়ের সঙ্গে ঢাকায় এলো শিউলি। শিউলির স্বভাব চরিত্র অত্যন্ত গরম। একবার রাগ উঠলে থামানো খুবই কঠিন কাজ। শরীরে যতোক্ষণ রাগ থাকে ততোক্ষণ মায়ের নাম ধরে ডাকে। বলেন শেফালি ম্যাডাম। সকালের এই ঘটনার পর শুরু হলো শেফালি ম্যাডাম, শেফালি ম্যাডাম! দুপুরে ডাইনিং টেবিলে শিউলি আবার চেচামেচি শুরু করলো। শেফালি ম্যাডাম, আমার কাচামরিচ কই? শিউলির যেদিন মাথা গরম থাকে সেদিন কাচামরিচ না খাওয়া পর্যন্ত মাথা ঠাণ্ডা হয় না।

পলাশের আবার উল্টো স্বভাব। মাথা গরম হলে পায়েস ছাড়া মগজের তাপমাত্রা শূন্যের কোঠায় নামে না। খেলায় হারলেও এমনটি হয়। ফৃজের ঠাণ্ডা পায়েস খাচ্ছে পলাশ। ডাইনিং টেবিলের অপর

পাশে শিউলি ভাতের সঙ্গে কচ কচ করে কাচামরিচ চিবুচ্ছে। শেফালি ম্যাডাম মাথায় হাত বোলাচ্ছে এবং গ্লাস দিয়ে বার বার পানি খাওয়াচ্ছে।

পলাশের মা এসেই বললেন, ঠিক আছে বাবা, এবার ভাত খাওয়া শুরু করো।

পলাশ বলে, মা, ভাতে পানি ঢালো। আজ পানিভাত খাবো চিনি দিয়ে।

চট করে অতি বিনয়ের সঙ্গে শিউলি বলে ফেললো, বকুল ম্যাডাম, আমার ভাতগুলো ওভেনে দিয়ে আরো গরম করে দেবেন কি? আমি আবার ওই সব হাদারাম গামলাদের মতো ঠাণ্ডা খেতে পারবো না।

ব্যস শুরু হলো আবার লংকাকাণ্ড।

এই, তুই আমার মায়ের নাম ধরে ডাকলি কেন?

আমার ইচ্ছা, আমার খালামণিকে যা খুশি তাই বলবো তাতে তোর কি?

কি, আমাদের বাসায় এসে আমাকেই তুই করে বলছিস?

তোর থেকে আমি তিন বছরের বড়। একশবার বলবো, হাজারবার, লক্ষবার, কোটি কোটিবার বলবো। বলতে বলতে মুখ ব্যথা হলেও বলবো।

বকুল ইশারায় শেফালিকে বললো, অবস্থা সুবিধাজনক নয়। না জানি হিতে বিপরীত হয়ে যায়। এখনই দুটোকে আলাদা করতে হবে। প্ল্যান পরিবর্তন করা অবশ্যই জরুরি।

পলাশ সব সময় বিকেলে লম্বা একটা ঘুম দেয়। কিন্তু আজ ঘরে থাকতে ইচ্ছা করছে না। ব্যাট–বল নিয়ে আবার প্র্যাকটিসের উদ্দেশ্যে মাঠে চললো।

শিউলির কোনো সকাল–দুপুর–বিকেল নেই। যখন ইচ্ছা হয় তখনই মাছ ধরতে যাবে, না হয় পাখির বাসার ডিম গুণবে অথবা গাছে গাছে চড়ে বেড়াবে। তাল গাছ, বেল গাছ, পেয়ারা গাছ কিছুই বাদ রাখে না। যখন যে ফলের মরসুম তখন সেই গাছগুলোর করুণ দশা করে ছাড়ে। আজ পিছু নিয়েছে পলাশের।

মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে কৃকেট খেলেছে পলাশ। শিউলি মাঠের পাশে আধো ভাঙা কৃষ্ণচূড়া গাছের ডালে উঠে পলাশকে ঠ্যাং দেখাচ্ছে আর বলছে –

আমাগো বাড়ির ময়নার বাপ গোস্ত রানতে জানে

আস্তা গরু পাতিলে দিয়ে লেজে ধরে টানে।

যেই বলা অমনি পলাশ ধরাম করে একটা ছক্কা হাকলো কৃষ্ণচূড়া গাছে। লাগলো শিউলির পায়ে। চোটটা তেমন লাগেনি। উহ রে, গেলাম গেলাম বলে পড়ে গেল মাটিতে। পলাশ দৌড়ে এসে দেখবে, এমন সময় কৃকেটের শক্ত বলটা পলাশের কপালে ধরাম করে শিউলি মেরে দিল। কপাল দিয়ে রক্ত। লোকজন ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, কপালে দুটো সেলাই। অবশেষে এক সপ্তাহের বেড রেস্ট।

কপাল ফাটার সঠিক কারণ বাসায় কাউকে পলাশ জানায়নি। শিউলিও খুব ভয় পেয়েছে। পলাশ প্রতিশোধের প্রহর গুণছে। শিউলি লুকিয়ে লুকিয়ে পলাশের ঘরে এসে তাকে দেখে যায়। পলাশ একদিন টের পেয়েও তাকে কিছু বুঝতে দেয়নি। মনে মনে বলে, *দশ দিন চোরের, একদিন গৃহস্থের।*

সেই সুযোগে শিউলির সৌন্দর্য পলাশ চুরি করে উপভোগ করতে থাকে এর পরিণতি কি হবে তা না ভেবেই।

দিন দিন শিউলির পরিবর্তন লক্ষ্য করছে বকুল এবং শেফালি। মেয়েটা কেমন যেন চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে! একদিন শিউলি ঘরের বাইরে সিড়িতে হাটুর সঙ্গে কপাল গুজে কুজো হয়ে বসে কাদছে। পিয়ন এসে বলে চিঠি! চিঠি! বকুল বেগমের চিঠি। জার্মানি থেকে এসেছে।

শিউলি তড়িঘড়ি করে চোখ মুছে পরিচয় দিয়ে চিঠিটা নিয়ে সোজা ছাদে চলে যায়। শিউলির একটা বদঅভ্যাস হলো, গ্রামের যাদের চিঠি আসতো, বিশেষ কৌশলে খামের আঠাযুক্ত অংশ খুলে পড়ে তারপর আবার সঠিক প্রাপকের কাছে দিয়ে দিতো। এই চিঠিটা শিউলির জীবনে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এনে দিল। আনন্দে শিউলির বুকটা ছলাৎ ছলাৎ করে উঠলো।

আজ পলাশের সেলাই কাটবে। ডাক্তার সন্ধ্যার আগেই বাসায় এসে কাজটি সেরে যাবে। বকুল এবং শেফালির চোখের ভ্রূ আজ দুপুরের পর থেকে কপালে উঠতে শুরু করলো। শিউলি একটার পর একটা চমক দেখিয়ে যাচ্ছে।

পলাশের মা ভাবেন মাটির মতো এমন নরম মেয়ে কি করে হলো? নিশ্চয়ই উপরওয়ালার বিশেষ রহমত।

বকুলের মুখ থেকে কথা টেনে নিয়ে শেফালি বললো, আমার মেয়ে আমি চিনি, হাড়বজ্জাত মেয়ে। কে জানে আবার কোন মতলব করছে?

বুবু, আমি আর দুদিন দেখবো। এর মধ্যে যদি দুলাভাইয়ের চিঠি না আসে, দস্যি মেয়েটাকে নিয়ে গ্রামে চলে যাবো। আমার সন্দেহ হচ্ছে, পলাশের মাথাটা ওই ফাটিয়েছে হয়তো।

একদিকে ডাক্তার পলাশের সেলাই কাটছে, অন্য রুমে শিউলি দরজা বন্ধ করে কি যেন করছে। বকুল ও শেফালি ডাক্তারকে সিড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসেই দেখে শিউলি খুব সুন্দর একটা শাড়ি পরেছে, এতো চমৎকার করে সেজেছে দেখতে একেবারে তাজা ফুলের মতো মনে হয়। বকুল ও শেফালি দুইজন হা হয়ে দাড়িয়ে আছে।

গম্ভীর কণ্ঠে শিউলি নিজের মা এবং পলাশের মাকে বলে, শেফালি ম্যাডাম, খালামণি, পলাশের সঙ্গে আমি দেখা করবো, তোমরা একটু অন্য রুমে যাও।

এ কয়েকদিনে পলাশের নিস্তরঙ্গ জীবনে হঠাৎ একটু ঢেউ উঠলো। দুই চোখ ছল ছল করছে আর ভাবছে, শিউলি এতো সুন্দর হলো কি করে? ঝকঝকে প্রাণবন্ত এক সুন্দরী।

শিউলি দরজা বন্ধ করে পলাশের চোখে চোখ রেখে অদ্ভুত ভঙ্গি করে বললো, এই যে মিস্টার! হা করে দেখছেন কি?

পলাশের জন্য এমন এক আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য অপেক্ষা করছে তা ভাবতেই পারে না। আবেগের বাষ্প ভেতর থেকে গলার দিকে ঠেলে উঠতে চাইছে। শিউলি, তোর এসবের কোনো মানে খুজে পাচ্ছি না।

লক্ষ্মী সোনামণি এখনই মানে খুজে পাবে।

কি বলছিস তুই?

পলাশের প্রশ্নভরা চোখ আর ধোকা খাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে শিউলি মধুর ভঙ্গিমায় হাসলো। আমার এই পরিবর্তনের কারণ এখনই বুঝবি। শিউলি শাড়ির আচলের কোণা থেকে একটা ভাজ করা কাগজ দিয়ে বলে, নে ধর, এটা পড়।

পলাশ কাগজটা খুলে পড়া শুরু করলো –

এলাহি ভরসা

জার্মানি থেকে

প্রিয় বকুল

আমার শত কোটি ভালোবাসা নিও। আশা করি আল্লাহর রহমতে বাংলাদেশের মাটিতে আমার অতি আদরের একমাত্র সন্তান পলাশ বাবাজিকে নিয়ে বেশ ভালোই আছো। আমিও তোমাদের দোয়ার বরকতে বিদেশের মাটিতে এক প্রকার ভালো আছি।

পর সংবাদ এই যে, তোমাকে আমি আগের চিঠিতে লিখেছিলাম, যে করেই হোক তোমার বোন শেফালির একমাত্র মেয়ে শিউলিকে কুমিল্লা থেকে আমাদের বাসায় এনে কিছুদিন রেখো। যদি আল্লাহর হুকুম থাকে এবং পলাশ ও শিউলি দুজন দুজনকে পছন্দ করে তাহলে আমাদের অনেক দিনের একটা আশা পূরণ হবে। প্রিয় বকুল, আমার খুব ইচ্ছা শিউলি মামণিকে আমার পুত্রবধূ করার। আমার পলাশকে মানুষ করতে হলে ওই রকম দুরন্তপনা মেয়ে ছাড়া আর কোনো পথ দেখি না। তাছাড়া ছোটবেলা থেকে বাপহারা মেয়েটার প্রতি আমার টান অন্য রকম। যদি সব কিছু হিসাব মতো মিলে যায় তাহলে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে আমাকে জানিও, আমি টাকা পাঠিয়ে দেবো।

ভালো থেকো, সুন্দর থেকো, আমার আশা যেন পূরণ হয় এই কামনায়।

ইতি –

তোমার প্রাণপ্রিয়

ফজলুল হক

চিঠিটা পড়ে পলাশের হৃৎপিণ্ড থেমে যাবার উপক্রম হলো। চিঠির পাতা থেকে চোখ তুলে শিউলির চোখে চোখ রেখে নিজের সঙ্গেই বোঝাপড়া করছে। একটা মেয়ের এতো গ্ল্যামার থাকতে পারে, তা এতো কাছে থেকে কখনো দেখিনি। যেন এক স্বপ্নপুরীর নায়িকা।

ঠিক সেই সময়ে একটা মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠ শুনে পলাশের ভাবনায় ছেদ পড়লো, ভালোবাসি। ভালোবাসি এবং ভালোবাসি।

গলাচিপা, নারায়ণগঞ্জ থেকে

মনেপ্রাণে

– জীবননেছা

রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে আমি। দুই পরিবারের সম্মতিতে আমাদের এনগেজমেন্ট হয়ে গেল। তারপরও আমার হবু স্বামী আমার সঙ্গে দেখা করেনি এবং আমিও চাইনি আমাদের দেখা হোক।

মধ্যপক্ষ চালাকি করে আমাদের দেখা করার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমার জরুরি কাজ থাকায় তার সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না। আবারও দিন নির্দিষ্ট হলো এবং আমাদের দেখা হলো।

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো, রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে হলেও ইচ্ছা মতো কাজ করা আমার স্বভাব হয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনচেতা হওয়াতে বিয়ের জীবন একদম ভালো লাগতো না। বিয়ের জীবন বন্দী জীবন মনে হওয়ায় ভবিষ্যৎ জীবন একা পার করে দেবো এটাই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বাবা–মা, ভাই–বোন সবার অনুরোধে বিয়েতে রাজি হলাম। ভাবলাম, কপালে যা আছে তা হবেই। তবু পরিবারের সবাই আমার ওপর খুশি থাকুক।

যাহোক, বিয়ে ঠিক হলো এমন লোকের সঙ্গে যাকে আমার সহজ–সরল এবং বোকা মনে হতো। যখন আমরা দেখা করলাম তখন আমার সঙ্গে সে কথা বলতে কেমন যেন ভয় পাচ্ছিল। এটা দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত এই ছিল আমার কপালে? একটা ভীতুর ডিম নিয়ে আমাকে জীবন পার করে দিতে হবে এই ভেবে। তাই তার প্রতি করুণা হলেও খুব রেগে রেগে কথা বলছিলাম। কথা বলছিলাম এমনভাবে যাতে একটুও ভালোবাসার গন্ধ ছিল না।

প্রায় দুই ঘণ্টা সামনাসামনি বসে থেকে কথা বলেছি মাত্র কয়েকটি। সময় অনেকটা গড়িয়ে যাওয়াতে হবু স্বামীর কাছ থেকে আমাকে বিদায় নিতে হলো। বিদায়বেলা সে আমাকে সুন্দর একটা গিফট দিল। নিতে চাইনি এই কারণে যে, আমি জানি বিয়ের আসরে বসেও কতো বিয়ে ভেঙে যায় আর আমাদের তো কেবল এনগেজমেন্ট হয়েছে। আল্লাহ না করুক শেষ পর্যন্ত যদি আমাদের বিয়ে না হয় এই ভয়ে। তবু সে অনেক অনুরোধ করায় শেষে গিফট নিয়েই নিলাম।

ভালো থেকো, ভালো থাকবেন, এই বলে বিদায় নিলাম আমরা।

বাইরে বেরিয়ে পরিচিত কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছিলাম। বেশ কিছুটা সময় কথা বলার পর হঠাৎ করে আমার দৃষ্টি ঘরের দিকে গেল। দেখি আমার হবু স্বামী দুই হাতে গৃল ধরে বারান্দায় দাড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে দেখে আমার খুব লজ্জা হচ্ছিল।

অবাক হয়ে গেলাম নিজের পরিবর্তন দেখে। কারণ এই একটু আগে যার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল না তার প্রতি এতো ভালোবাসা কোথা থেকে এলো? হলফ করে বলতে পারি, যদি ইসলামে নিষিদ্ধ না থাকতো তবে তার সঙ্গে রোজই কথা বলতাম। এতে কারো বাধা মানতাম না। এও বুঝতে পেরেছি কেন প্রেম করে প্রেমিক–প্রেমিকা পালিয়ে যায়। তার সঙ্গে প্রতিদিন কথা বলতে ইচ্ছা করলেও কখনো কথা বলিনি। এখন অবশ্য প্রতিদিনই তার সঙ্গে কথা বলতে হয় তার ঘরনি হওয়াতে। সেদিন সেই ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়ার দিন থেকে মনে–প্রাণে তার হয়ে গেলাম এবং তারই থাকতে চাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত।

গাজীপুর, বেনাপোল থেকে

জেনে শুনে বিষ...

সেদিন ছিল সোমবার ২৪ জুন ২০০২ – একটা কমপিউটার ট্রেনিং কেন্দ্রে ভর্তির নিমিত্তে মৌখিক পরীক্ষা ছিল আমার। সকাল সাড়ে নয়টায় ট্রেনিং কেন্দ্রে উপস্থিত হই এবং সময় মতো আমার ডাক পড়ে। পরীক্ষা বোর্ড রুমে ঢুকলে বোর্ড ডিরেক্টর আমাকে সামনের চেয়ারে বসতে বললেন। বোর্ডের অন্যান্য সদস্যরা প্রশ্ন করলে যথাসম্ভব চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম উত্তর দেয়ার।

বলে রাখা ভালো, ওই বোর্ড ডিরেক্টর সম্পর্কে আমি আগে থেকেই জেনেছিলাম তিনি সুন্দরের পূজারি ও প্রেমিক পুরুষ। তাই তাকে সামনাসামনি দেখার কৌতূহলটা একটু বেশিই ছিল। দূর থেকে অনেক দিনের জানা মানুষটাকে মুখোমুখি দেখা এবং কথা হওয়ার প্রবল ইচ্ছা আমার মধ্যে ঝড় তুলেছিল। তাকে দেখে আমিও আকর্ষণ বোধ করি। অস্বাভাবিক উচ্চতার মানুষটার ছিল অত্যন্ত সুন্দর এবং আকর্ষণীয় দুটি চোখ। তার চোখ দুটির মতোই সুন্দর তার রোমান্টিক মন। বয়সে একটু ভারী হলেও তার মধ্যে ছিল আঠারো বছরের যুবকের তারুণ্য এবং সম্মোহন ক্ষমতা যা আমাকে আকৃষ্ট করে গভীরভাবে।

ওই ট্রেনিং কেন্দ্রে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাই। প্রথম দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তার সাবলীল বক্তৃতা আমাকে আরো বিমোহিত করে। তার কথা বলার ধরন আর অপলক চাহনি আমাকে ব্যাকুল করে তোলে। ক্লাস চলাকালে বিভিন্ন অজুহাতে তার সঙ্গে দেখা করতাম। মাঝে মধ্যে আমাকে তিনি ডেকে পাঠাতেন। কথা হতে হতে এক পর্যায়ে আমাদের মাঝে সুন্দর একটা সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। যে মানুষটা সম্পর্কে অনেক বাজে কথা শুনেছি তার সঙ্গে মিশে দেখেছি অত্যন্ত সুন্দর একটা মনের মানুষ তিনি। তার চোখে এমন মাদকতা আছে সেটা যে কোনো নারীকে বশ করতে সক্ষম।

এ রকম চলতে থাকলে এক পর্যায়ে তার প্রতি প্রচণ্ড রকম দুর্বল হয়ে পড়ি। তার প্রতি আমার এক অন্য রকম ভালোবাসার সৃষ্টি হয়। প্রতিদিন একবার দেখা, কথা না হলে বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা কষ্ট এফোড়–ওফোড় করে দেয়।

প্রতিদিন কথা হয়, দেখা হয় তারপরও কি যেন অব্যক্ত থেকে যায়। তাই মাঝে মধ্যে চিঠি দেয়া–নেয়া হতো। তিনি খুব সুন্দর লেখেন। তার প্রত্যেকটা চিঠি অসংখ্যবার পড়েছি। আমার অস্তিত্বে তার সরব উপস্থিতি অনুভব করতে থাকি। আমার প্রতিটা মুহূর্ত, অলস দুপুর, ক্লান্ত বিকেলগুলো কাটে শুধু তাকেই ভেবে। জানি না কোন অজানা পথে অগ্রসর হচ্ছি।

একদিন ক্লাসের পরে তার সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়। তিনি এক পর্যায়ে আমার হাতে হাত রাখেন। শিহরিত হই। ভালোলাগা মানুষটার প্রথম স্পর্শ অনুভব করি চোখ বন্ধ করে। এক সময় তার ঠোঁট আবিষ্কার করি আমার নরম কোমল ঠোঁটে। মাতোয়ারা হই। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিই একে অপরকে।

তারপর আর আমাদের পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। মনের মিলন থাকলে দেহের মিলন হওয়াটা স্বাভাবিক। তাই আমাদের মধ্যে দেহের মিলন হয় এক সময়ে।

প্রত্যেক সপ্তাহে আমরা দুই তিনবার মিলিত হতাম মিলন খেলায়। তখন ছিল রমজান মাস। রমজানের পবিত্রতা রক্ষার্থে সংযম সাধন আমরা করতে পারিনি। তবে বেডরুমে আমরা মিলিত হতাম নির্দ্বিধায়, নিঃসংকোচে। পাগলের মতো ছুটে যেতাম ওই স্বর্গীয় সুধা অন্বেষণে। অন্য রকম ভালোবাসার উথাল–পাথাল সাগরে আমরা ভাসালাম দেহতরী।

যদিও আমাদের বয়সের পার্থক্যটা একটু বেশি ছিল। কিন্তু আমাদের এ অন্য রকম ভালোবাসায় বয়সটা কোনো বাধা হয়ে দাড়ায়নি। তিনি ছিলেন সদ্য বিবাহিত। স্ত্রী অন্যত্র থাকতেন। সেই সুবাদে আমাদের মিলনে এতোটুকু বাধার সম্মুখীন হইনি। তবে আমার এ অন্য রকম ভালোবাসার কথা অনেকেই জানতো। তাতে আমার কোনো মাথা ব্যথা ছিল না, এখনো নেই।

আমার প্রথম প্রেম, অন্য রকম ভালোবাসার কথা কখনোই ভুলতে পারবো না। যতোদিন এ দেহে প্রাণ থাকবে ততোদিন আমার ভালোবাসা থাকবে তার প্রতি। আমি জানি তিনি হয়তো এতোদিনে আমার মতো অন্য কোনো নারীর মধু অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাতেও আমার কোনো আপত্তি নেই। কারণ ওনারা এ রকমই হন।

প্রিয় পাঠক, আমার এ অন্য রকম ভালোবাসার *সাতকাহন* পড়ে আপনারা আমাকে ঘৃণা করবেন না সে কথা বলার স্পর্ধা আমার নেই। আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান। আমি যা হারিয়েছি তা আর ফেরত পাওয়ার আশা করতে পারি না। সব লুটপাট হওয়ার পর নিঃস্ব দেহে, ভগ্ন হৃদয়ে চৈতন্যদয় হলো অবশেষে। বুঝতে পারলাম ওই মানুষটি নারীর যৌবন লিপ্সু মুখোশধারী। আমার এ অন্য রকম ভালোবাসার কথা আপনাদের জানানো আর সতর্ক করার জন্যই এ লেখা। আপনারা আমার মতো কেউ অন্য রকম ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হবেন না।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক, বাগেরহাট থেকে

শাদা চুল

প্রিয়তম কমলার আব্বা,

আজ আমার আমিকে হারিয়ে নতুন জীবন লাভ করেছি তোমার ভালোবাসার ছোয়ায়। আমাদের দশ বছরের ভালোবাসাকে একটু রাঙিয়ে নিতে চাই আজ। প্রিয়, এ মুহূর্তে আমার ভালোবাসার সিংহভাগ অবস্থান করছে তোমার মাথার শাদা চুলে।

প্লিজ, লক্ষ্মী সোনা, আমাকে দিয়ে চুলগুলো উঠিয়ো না। কোরেশী আঙ্কলের মতো তোমার মাথা ভর্তি শাদা চুল। উহ, যা হ্যান্ডসাম লাগবে তোমাকে! কি, রাগিয়ে দিলাম? জি না, আজকের দিনে রাগতে নেই। আজ যে ভালোবাসার দিন। ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি শুধুই তোমাকে।

বৌ
ঢাকা ইউনিভার্সিটি

সংকোচ

– গুলজার

মনির সঙ্গে এভাবে দেখা হয়ে যাবে কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। ধরে নিয়েছিলাম যে, মনির সঙ্গে জীবনে আর কোনোদিন দেখা হবে না। কিন্তু অনেকটা অলৌকিকভাবেই তার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল।

পুরনো ঢাকায় আমার এক সহকর্মীর বাসায় তাদের এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। সহকর্মীটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সেই সুবাদে তার পরিবারের সঙ্গেও সৌহার্দপূর্ণ। অনুষ্ঠান শেষে সহকর্মী রফিক খোশগল্পের মাঝে আমাকে জানালো যে, আমার এক আত্মীয়া আমাদের এখানে বেড়াতে এসেছে। এক সময় তারা আপনাদের এলাকায় ছিল। হয়তো তাকে আপনি চিনতে পারবেন। তার নাম জিজ্ঞাসা করতেই রফিক বললো, মনি।

আমি চমকে উঠলাম। আমার হৃদয়ে গাথা একটি নাম। আগ্রহ চেপে রেখে বললাম, ডাকুন তো। কিছুক্ষণের মধ্যে মনি এসে আমার সামনে বসলো।

মনি আমার সামনে বসা। পয়ত্রিশ বছর পর তার সঙ্গে দেখা। যৌবন পেরিয়ে পৌঢ়ত্বের কোঠায় পা দিয়েছে। তবু তার চেহারা সে রকমই আছে যদিও কিছুটা মোটা হয়ে গেছে। গায়ের রঙয়ের উজ্জ্বলতাও অনেকটা ম্লান হয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর নীরবতা ভেঙে আমিই প্রথম বললাম, আমাকে চিনতে পেরেছো?

মনি কিছু না বলে মাথা নাড়লো।

মনের অজান্তে পয়ত্রিশ বছরের হারানো জীবনে ফিরে গেলাম। ষাটের দশকের শেষ দিক। ছোট মহকুমা শহর বাগেরহাট। পাকা দালানের সংখ্যা খুব কম। অধিকাংশ বাড়িগুলোতে গোল পাতার ঘর। বিনোদনের মাধ্যমে বলতে একটা মাত্র সিনেমা হল। রূপসা থেকে বাগেরহাট পর্যন্ত বিশ মাইলের একটি অ্যারোগেজ ট্রেন লাইন। দিনরাত মিলে চারবার যাওয়া আসা করে। তখনকার দিনে খুব কম লোকেই ঘড়ি কিনতে পারতো। ট্রেনের যাওয়া-আসা এবং সিনেমার শো শুরু-ভাঙার ওপর অধিকাংশ লোক সময় নির্ধারণ করতো।

চলাচলের একমাত্র বাহন ছিল রিকশা। রিকশাচালকরা সারাদিন বলতে গেলে যাত্রীবিহীন অবস্থায় বসে থাকতো। ট্রেন এলে তার যাত্রী এবং সিনেমা শেষ হলে তার দর্শকরাই ছিল রিকশায় চড়ার মতো যাত্রী। সেই আমলে মনিরা আমাদের মহল্লায় থাকতো। তার বাবা বাগেরহাট আদালতে চাকরি করতেন। আমাদের মহল্লায় তখন চোখে পড়ার মতো বেশ কয়েকটা সুন্দরী মেয়ে ছিল। কিন্তু মনি তাদের মতো সাধারণ মেয়ে ছিল না। তার ভেতরে কিছু ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট ছিল। সে কথা কম বলতো। কোনো আড্ডায় তাকে পাওয়া যেতো না। চুপচাপ থাকতে বেশি ভালোবাসতো। বেশ মেধাবী ছাত্রী ছিল। মনি আমার ছোট বোনের সঙ্গে পড়তো। কিন্তু সেই সুবাদে সে আমাদের বাসায় এসেছে মাত্র দুই চারবার মাত্র।

আমার তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা সবেমাত্র শেষ হয়েছে। ফল বের হতে তিন মাস বাকি। হাতে অফুরন্ত সময়। কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই, নেই কোনো পড়াশোনার চাপ। মুক্ত বিহঙ্গের মতো সময় কাটাচ্ছি। কিন্তু ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় যেভাবে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে পড়তে বসতাম সেই ভোরে ওঠার অভ্যাস তখনো ঠিক মতো আছে। তেমনি একদিন ভোরে প্রাতঃভ্রমণের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম। বেড়াতে বেড়াতে মনিদের বাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ করে মনির সঙ্গে চোখাচোখি হলো। সুন্দর দুটি চোখ যেন গহীন বনে হঠাৎ থমকে যাওয়া কোনো হরিণীর চোখ। আমি অবাক বিস্ময়ে তাকালাম কিছুক্ষণ। ওই চোখে যেন ভাষা আছে। তবে তা অব্যক্ত। ভাবলাম সে হয়তো কিছু বলবে। না, কিছু বললো না। আমিও সাহস করে কিছু বলতে পারলাম না।

পড়াশোনার চাপে হৃদয়ের অনুভূতিগুলো এতোদিন চাপা পড়েছিল। আজ যেন হঠাৎ জাগ্রত হলো। মনিকে আমার ভীষণ ভালো লাগলো যা এর আগে কোনোদিন লাগেনি। এক তরফাভাবে তার প্রেমে পড়ে গেলাম। কিন্তু আমার এই ভালোবাসা তাকে জানাই কিভাবে?

একের পর এক পরিকল্পনা করতে লাগলাম। কখনো স্কুল ছুটির পথে, কখনো নির্জন রাস্তায় আবার কখনো বাসায় বেড়াতে এলে ছোট বোনের অনুপস্থিতিতে। কিন্তু না, পারিনি। যখনি কিছু বলবো বলে উদ্যোগ নিয়েছি তখনি দুনিয়ার যতো লজ্জা, ভয়, সংকোচ, জড়তা ইত্যাদি এসে আমাকে বাধা দিয়েছে। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন মনির বাবা বদলি হয়ে গেলেন। মনিরা বাগেরহাট ছেড়ে চলে গেল। এর কিছুদিন পর আমিও ঢাকায় চলে এলাম। এখানে কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে পড়া শেষ করলাম। চাকরি পেলাম। ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিতও হলাম। একদিন বিয়ে করলাম এবং সংসারী হলাম। আমার ছেলেরাই এখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে।

কলেজ, ইউনিভার্সিটি জীবনে মনির কথা আমার প্রায়ই মনে পড়তো। তার স্মৃতি আমাকে অহরহ আন্দোলিত করতো। মাঝে মধ্যে আক্ষেপ করতাম, কেন তাকে আমার ভালোবাসার কথা জানানো হলো না। বিবাহিত জীবনেও মনির স্মৃতি আমার হৃদয়ের মণিকোঠায় বারকয়েক উকি দিয়েছে।

আজ পয়ত্রিশ বছর পর তার দেখা পেলাম। তাকে কাছে পেলাম। দুজনে মুখোমুখি বসলাম। বন্ধু রফিক এক ফাকে ভেতরের রুমে চলে গেল। শুধু এই রুমে আমরা দুজন। নির্জন পরিবেশ। ভাবলাম, এখন তো আমাদের দুজনের কারো মধ্যে কোনো জড়তা, লজ্জা, সংকোচ নেই। পয়ত্রিশ বছর আগের সেই সুপ্ত ভালোবাসার স্মৃতি তাকে জানিয়ে দিই। কয়েকবার গলা পরিষ্কার করলাম। উদ্যোগ নিয়ে প্রথমে তার ভাইবোনেরা কে কোথায় আছে জেনে নিলাম। সেও আমার কাছ থেকে তার পুরনো দিনের সঙ্গীদের কথা জেনে নিল। কিন্তু বার বার গলা পরিষ্কার করেও মনিকে বলতে পারলাম না আমার সুপ্ত ভালোবাসার স্মৃতি।

এক সময় মনি উঠে দাড়ালো।

বললো, আজ তবে উঠি।

ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলাম রাত তখন এগারোটা। আমাকে যেতে হবে বহুদূর।

ঢাকা থেকে

উপলব্ধি

– এম. মুজিবুল হক

নানির ডাকে ঘুম ভাঙলো। সারা রাত গরমের কারণে ঘুমাতে পারিনি। কিছু বুঝে ওঠার আগে নানাজান হুংকার দিয়ে উঠলেন, নবাব সাহেব এখনো তৈরি হয়নি? আজ এসএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। পরীক্ষার্থী আমি নই, আমার ছোট বোন রেহানা এবং খালাতো বোন বুলবুলি ও ঝিনুকের। তাদের পরীক্ষার হলে নেয়ার দায়িত্ব আমার। তাই নানাজানের এতো তাড়া। আমরা থাকি চট্টগ্রাম

শহরে। আর গ্রামীণ অঞ্চলে পরীক্ষা একটু সহজতর হওয়ার কারণে বোনকে এখানকার স্কুলে ভর্তি করিয়েছি যাতে সহজে উতরে যেতে পারে এবং খালার বাড়ি নানার বাড়ির কাছে।

সকাল আটটার মধ্যেই দুটি রিকশা যোগে তাদের নিয়ে রওনা হলাম। সাত কিলোমিটার দূরে পরীক্ষা কেন্দ্র, আমার মনে এক ধরনের খুশির ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। কারণ হলো, পরীক্ষা নিজেও দিয়েছি আর পরীক্ষা দেয়ার সুবাদে পরীক্ষা হলেও তার আশপাশে নারী-পুরুষের যে মিলনমেলা দেখেছি সেই দৃশ্যটি ভাবতেই আত্মহারা হয়ে যাই। কারণ নিজে যখন পরীক্ষা দিচ্ছিলাম, পরীক্ষার টেনশনে অন্য কিছু ভাবার অবকাশ ছিল না। প্রায় পাচ কিলোমিটার পাকা রাস্তা। অর্থাৎ হাজির রাস্তা থেকে আমিরাবাদ এবং আরো দুই কিলোমিটার ধূলা মাখা মাটির রাস্তা অতিক্রম করে যখন গোলাম বারী হাই স্কুল প্রাঙ্গণে এলাম সময় তখন সাড়ে নয়টা।

বোনদের যার যার সিটে বসিয়ে বাইরে এলাম। একটি টঙ দোকানের পাশে দাড়াতেই ভীতু পায়ে আগত মেয়েটির চোখে চোখ আটকে গেল। দুজনের কেউই চোখ নামাইনি। প্রথম দর্শনেই ভালো লেগে গেল।

আমার সামনে থেকে যাবার পর মেয়েটির হাটা লক্ষ্য করলাম, খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাটছে। পাশেই দাড়ানো ছিল মেয়েটি ও তার বোনকে নিয়ে আসা রিকশা। যতোদিন পরীক্ষা চলবে ততোদিন মোতালেব নামের এই রিকশাচালক তাদের নিয়ে আসবে। মোতালেবের বাড়িও মেয়েটির গ্রামে।

তিন বছর পর দুবাই থেকে এসেছি। পকেটে প্রচুর টাকা। মোতালেবকে মোটকার পানি থেকে তুলে আনা মিরিন্ডা ও কলা ভেজা চিড়া খাওয়াতেই তোতা পাখির মতো সব বলে গেল।

মেয়েটির নাম নিশাত। পিতা স্কুল শিক্ষক। বাড়ি আমার নানাদের দুই গ্রাম পরে চুনতি গ্রামে। ছোটবেলায় পোলিও আক্রান্ত হওয়ায় বাম পা ছোট হয়ে গেছে। তার কাছে বিস্তারিত জানার পর নিশাতকে মনে ঠাই দিয়ে ফেললাম। পরীক্ষা শেষে তাদের নির্দিষ্ট রিকশা করে রওনা দেয়। আমি হেটেই আসছিলাম। আমার বোনদের রিকশায় তুলে দিয়ে কিছুদূর আসার পরই খেয়াল করলাম একটি রিকশা থেকে ভ্যানিটি ব্যাগ পড়ে গেছে। ধূলা ঝেড়ে যাত্রীর হাতে তুলে দিতেই দেখি অন্য কেউ নয়, নিশাতই। হাসি মুখে ধন্যবাদ জানালো এবং তার নেশা ভরা নয়ন যুগলে আটকে গেল আমার নয়ন। এক আশ্চর্য ধরনের সুখানুভূতিতে মন ভরে গেল।

নানাবাড়িতে ফিরে সারাটা দিন কেটে গেল তার কথা ভাবতে ভাবতে। রাতটাও কেটে গেল ওভাবে। তার পরদিন পরীক্ষা ছিল না। মামাতো ভাই ইলিয়াসকে নিয়ে একটা ভাঙা-চোরা এয়ারগান হাতে বের হলাম শিকারের বাহানায় তাদের বাড়ি খুজতে। ঘণ্টা ছয়েক ঘুরতে ঘুরতে দুইটি নিরীহ টিয়া, একটি শালিক ও একটি বক শিকার করলাম।

এক পর্যায়ে খুজে পাই তাদের ঘর। পাহাড়ের পাদদেশে হাজারো বৃক্ষ সমৃদ্ধ একলা বাড়ি। নিচে একটি ছোট পুকুর। ওই পুকুরে ঠাসঠাস গুলি ছুড়তে লাগলাম তাদের কারো দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। হঠাৎ দেখি আমার স্বপ্নের রাজকন্যা পুকুর পাড়ে আসছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার যোগাড়। আমাদের দেখে সে এক প্রকার পালিয়ে গেল। আমরাও এক নিঃশ্বাসে পাহাড়ের উপরে ছুটলাম।

এমন জোরে দৌড়াচ্ছিলাম যে, যার সামনে পড়লাম তাকে বাঘিনিই বলা যায়। তিনি নিশাতের দাদি। উঠান ঝাড়ু দিচ্ছিলেন। তারপর উকিলের মতো জেরা শুরু করলেন।

আমরা বললাম, শিকার করতে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছি। প্রচণ্ড পিপাসা পেয়েছে, পানি চাই।
তিনি বললেন, টিউবওয়েল থেকে খেয়ে নিতে। হঠাৎ গম্ভীর পুরুষালি কণ্ঠের আওয়াজ শুনলাম।
এরা কারা, ভেতরে আসতে বলো।
বুকের মধ্যে কাপুনি শুরু হয়ে গেল।
ইলিয়াস বললো, আজ আমাদের ভালোই ধোলাই করবে। এবার আস্তে আস্তে মনে মনে আল্লাহকে ডেকে ভেতরে ঢুকতেই দেখি একটি সাইনবোর্ড – *আতাহার হোসাইন সিদ্দিকী, এম.এ. সাবেক কাস্টমস পরিদর্শক।*
ভয় আরো বেড়ে গেল। না ঢুকে উপায় নেই। কাপা কাপা গলায় সালাম দিলাম।
তিনি আমাদের সাদরেই বরণ করলেন। শ্বেতশুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধকে দেখে মন ভরে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আমরা কারা।
উত্তরে বললাম, শিকারে এসেছি। তারপর আমার নাম–ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ সব জেনে নিলেন। অন্দর মহলে চুড়ির রিনঝিন শব্দ ও গরম নিঃশ্বাস প্রিয়ার উপস্থিতির প্রমাণ করছে। যিনি নিশুর দাদা তিনি দুপুরে খাবার খেতে আমন্ত্রণ জানালেন। পেটে বিড়াল দৌড়াচ্ছিল তবুও ভদ্রতার খাতিরে এড়িয়ে গেলাম। তিনি আমাদের আবার আসতে বললেন।
আমিও কৌতুক করে বললাম, আসবো মানে, সেজেগুজেই আসবো।
তিনি আবার পবিত্র হাসি দিয়ে আমাদের বিদায় জানালেন।
তাদের ঘরে ঢোকার আগে গন্ধরাজ গাছ থেকে একটা ফুল ছিড়েছিলাম। আসার সময় তা জানালার ওপর রেখে আসি। এরপর থেকে প্রতিদিন পরীক্ষার হলে তার সঙ্গে দেখা হতো। আমার খালাতো বোনের মাধ্যমে তার কাছে একটি চিঠি পাঠাই। দশ দিনেও কোনো শুভ সংকেত না পেয়ে হতাশায় মুষড়ে পড়ি। রাগে দুঃখে শহরে চলে আসি। কোনো কাজে মন বসাতে পারছিলাম না। যেদিকে যাই তার হাসিমাখা মুখখানা ভেসে ওঠে। এভাবে বারো দিন পর আমাকে অবাক করে দিয়ে তার মধুমাখা পত্র আসে। মনে হলো তাতে আসমানের চাদ পেয়েছি। চিঠিতে লিখেছে আমার সম্পর্কে তার মা ও দাদুকে জানিয়েছে। দাদু নাকি আমাকে যেতে বলেছেন।
আমার ও তার মাঝে পত্র যোগাযোগে সম্পর্ক আরো গভীর হয়। আমার ছুটিও ফুরিয়ে আসছে। অবশেষে চার মাস পর ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩–এ প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে তাদের বাড়ি পৌছি গলা সমান পানি পেরিয়ে। দাদু আমার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করলেন এবং নিশাতকে আমার হাতে তুলে দেন বলেন যে, আমার বাবা মাকে জানিয়ে তুলে নিয়ে যেতে।
আমি প্রত্যুত্তরে বলি যে, আমার বড় ভাইয়া এখনো অবিবাহিত। তাছাড়া কয়েকদিন পর দুবাই ফিরে যাবো। একটি আংটি নিশাতের হাতে পরিয়ে দিয়ে দাদুকে বলি যে, নিশাতকে আমানত হিসেবে আপনার কাছে রেখে গেলাম। আমি এসে বুঝে নেবো।
নিশু আমাকে সজল চোখে বিদায় জানায়। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ সালে দুবাই চলে যাই। প্রতি সপ্তাহে তার পত্র পেতাম। সুখ–দুঃখের মাঝেই কেটে গেল চারটি বছর।

প্রবাস থেকে ফিরে আসি ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ তারিখে। আমার কৃপণতা নাকি অজ্ঞতা, হয়তো ভয়, নিশুর জন্য যা এনেছিলাম তা ঘরের সবাই নিয়ে নেয়। ভয়ে কি লজ্জায় কিছু বলিনি। অনেকটা খালি হাতেই তার কাছে উপস্থিত হই। তার কালো দুটি চোখ দেখেই ভুলে গেলাম গত চার বছরের কষ্ট।

আমি দুবাই থাকা অবস্থায় নিশাতের দাদা মারা যান। এ তথ্য আমার কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। নিশাতের মা আমাকে বিয়ের জন্য চাপ দিতে থাকেন। এদিকে আমাদের ঘরে নিশাত সম্পর্কে সব জেনে যায় এবং তাকে বরণ করতে অসম্মতি প্রকাশ করে। নিশাতও জানিয়ে দেয় আমাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করতে হলে বিষ খেয়ে জান দিয়ে দেবে।

এর মধ্যে দেশে ব্যবসায়ে জড়িয়ে যাই। মা বাবা পাত্রী খুজতে থাকেন। অবশেষে বৃদ্ধ পিতা মাতার কাছে হার মানতে বাধ্য হই। আরেকজনের মালা বরণ করি। কিন্তু তাকে ভুলতে পারিনি। সেও জানতো যে, তার কাছ থেকে অন্য কারো হয়ে গেছি। তবুও সম্পর্ক সামান্যতম শীতল হয়নি। আমিও তাকে বিয়ে করার প্রস্তুতি নিতে থাকি। এমন সময় ঘটে যায় জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা। ১৯ জুলাই ২০০১ তারিখ আমার বড় ভাই এক দুর্ঘটনায় মারা যান।

অতি শোকে বাকরুদ্ধ ছিলাম দুই মাস। এর মধ্যে গত ঈদুল ফিতরের পাচ দিন পর অর্থাৎ ২১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখেই তার সঙ্গে শেষ দেখা হয়। বড় ভাই মারা যাওয়ার মাত্র সাড়ে নয় মাসের ব্যবধানে আমার বাবাও মারা যান। পুত্র হারানোর শোক তিনি সহ্য করতে পারেননি। বড় ভাইয়া ও বাবার মৃত্যুতে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ি। ভুলে যাই পৃথিবীর রস–গন্ধ। এই অবস্থায় নিশাতের সঙ্গে কোনো যোগাযোগও হয়নি প্রায় এক বছর। তার সঙ্গে আমার সম্পর্কে নয় বছর কোনো মনোমালিন্য হয়নি।

আমার জীবনটা পাল্টে যেতো তাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেলে। কোন সাহসে তার কাছে গিয়ে দাড়াবো। তার দাদুকে দেয়া কথাও আমি রাখিনি। আমার অজ্ঞতা ও ভয় তার জীবনটা নষ্ট করে দিল। অভিশাপের এই আগুন থেকে রেহাই পাবো না জানি। কুমারিত্বকে সে বরণ করেছে আমার দেয়া অপমানে। আমাদের ঘরে নিশাতকে বরণ না করার কারণ ছিল একটাই।

সে পোলিও আক্রান্ত। সৌন্দর্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন ও বংশ মর্যাদায় সেসব কিছুতেই আমার চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না।

পোলিওর অভিশাপে নিশাত আমার ঘরনী হতে পারেনি।

পোলিও তার এক পা খাটো করেছে, তবু সে চলেছে।

কিন্তু আমি যে তার সারা জীবন পঙ্গু করে দিলাম। আমাকে কি নামে ডাকা যায়? সে কি আমাকে ক্ষমা করবে? তার অপেক্ষায় দিন গুণছি।

চকবাজার, চট্টগ্রাম থেকে